আনিসুজ্জামান

মুক্তিযুদ্ধ এবং তারপর



তৃতীয় মুদ্রণ পৌষ ১৪১৯ জানুয়ারি ২০১৩

প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৪০৫ জানুয়ারি ১৯৯৯
দ্বিতীয় মুদ্রণ মাঘ ১৪০৬ জানুয়ারি ২০০০

প্রচ্ছদ আনওয়ার ফারুক

প্রকাশক ওসমান গনি আগামী প্রকাশনী ৩৬ বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০ ফোন ৭১১-১৩৩২, ৭১১-০০২১

মুদ্রণ স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স ১৮/২৬/৪ শুকলাল দাস লেন ঢাকা

মূল্য : ২০০.০০ টাকা

ISBN 978 984 401 498 5

অগ্রজপ্রতিম

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানকে
অশেষ শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায়

নিবেদন

নিজের প্রবন্ধসংগ্রহ প্রকাশ করতে আমার খুব কুণ্ঠা হয়। প্রবন্ধগুলোর মধ্যে একটা ভাবগত সাযুজ্য না থাকলে দু মলাটের মধ্যে তাদের সহাবস্থান প্রায়ই পীড়াদায়ক হয়ে থাকে। এই বইতে যে-পনেরোটি প্রবন্ধ স্থান পেল, আশা করি, তার মধ্যে ভাবের যোগসূত্র লক্ষ্য করা যাবে।

প্রবন্ধগুলো বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন উপলক্ষে লেখা হয়েছিল। ফলে কিছু কিছু পুনরুক্তি আছে। এসব লেখার প্রথম প্রকাশ-সম্পর্কিত তথ্য নিচে দেওয়া গেল :

১. মুক্তিযুদ্ধের চেতনা : মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মঞ্চের উদ্‌যোগে ঢাকায় আয়োজিত একটি সেমিনারে পঠিত এবং ওই মঞ্চের *রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠান* পুস্তিকায় (ঢাকা, ১৯৯৬) মুদ্রিত।
২. শহীদেরা : *দৈনিক ইত্তেফাক,* ১৪ ডিসেম্বর ১৯৮৯।
৩. বাঙালি : *সংবাদ,* ১ বৈশাখ ১৩৯৯।
৪. বাংলাদেশ, বাঙালি ও বাংলাদেশি : *সুন্দরম্‌,* ভাদ্র-কার্তিক ১৩৯৮।
৫. ইতিহাসের শিক্ষা : *সংবাদ,* ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯২।
৬. সাম্প্রদায়িকতার প্রত্যাবর্তন : *ভোরের কাগজ,* ১৬ ডিসেম্বর ১৯৯২।
৭. ধর্মনিরপেক্ষতা : স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটি-প্রকাশিত *বাংলাদেশে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা* (ঢাকা, ১৯৮৯) গ্রন্থে সংকলিত।
৮. দেশ ভাষা জাতি : *দৈনিক ইত্তেফাক,* ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১।
৯. বাংলা ও ইংরেজি : *দৈনিক ইত্তেফাক,* ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩।
১০. বাংলাদেশ ও বাংলাভাষা : বাংলা একাডেমীতে প্রদত্ত ১৯৮৪ সালের বাংলা একাডেমী বক্তৃতা ; বাংলা একাডেমী-প্রকাশিত *একুশের প্রবন্ধ* ১৯৮৪ (ঢাকা, ১৯৮৫) গ্রন্থে সংকলিত।
১১. একতা কেন ? : সাপ্তাহিক *একতা,* ৯-১৫ অক্টোবর ১৯৯২।
১২. সকলের এবং কতিপয়ের : *ভোরের কাগজ,* ২৬ মার্চ ১৯৯৩।
১৩. বাংলাদেশে ধর্ম, রাজনীতি ও রাষ্ট্র : ২৪ আগস্ট ১৯৯৬ সালে প্রদত্ত সিধুভাই স্মারক বক্তৃতা। সামান্য সংশোধিত আকারে মুদ্রিত হয় *সুন্দরম্‌,* অগ্রহায়ণ-মাঘ ১৪০৩ -এ।
১৪. পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা : *দৈনিক ইত্তেফাক,* ২৯ নভেম্বর ১৯৯৭।
১৫. দেশ : *ভোরের কাগজ,* ২৬ মার্চ ১৯৯৭।

আগামী প্রকাশনীর ওসমান গনির আগ্রহ না থাকলে এই সংকলন প্রকাশিত হতো না। তার জন্যে, পাঠকের নয়, আমার ধন্যবাদ তাঁর প্রাপ্য।

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আনিসুজ্জামান
২০ আগস্ট ১৯৯৮

সূচিপত্র

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

১৯৭১ সালে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে, যদি কেউ আমাদের প্রশ্ন করতো, 'কেন তোমরা যুদ্ধ করছো?', তাহলে সম্ভবত আমরা জবাব দিতাম, 'পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর নারকীয় অত্যাচার থেকে দেশকে মুক্ত করতে'। জবাবটা ঠিকই হতো। তখন আমরা প্রতিমুহূর্তে মৃত্যু ও সম্ভ্রমহানি, মৃত্যুর অধিক গ্লানিকর অভিজ্ঞতা এবং নিজ বাসভূমে পরবাসী হবার নিদারুণ বোধের সম্মুখীন হয়েছিলাম। যে লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবনের ভয়ে আশ্রয় নিয়েছিল প্রতিবেশী দেশে, নিজের করে দেশকে ফিরে পাওয়াই ছিল তাদের কাছে বড় কথা।

তবে আমরা সবাই জানতাম, ১৯৭১ হঠাৎ করে আমাদের জীবনে আবির্ভূত হয়নি। সেদিনকার ঘটনাধারার পেছনে ছিল ২৪ বছরের সংগ্রামের ইতিহাস। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে পূর্ব বাংলায় যে-ভাবজগৎ গড়ে উঠছিল ধীরে ধীরে, পাকিস্তানের অপরাংশের কাছ থেকে তা ধীরে ধীরে আমাদের সরিয়ে নিয়েছিল অনেক দূরে। এই ভাবজগৎ আমাদের বস্তুজগৎকে অতটা নিয়ন্ত্রণ করেনি, যতটা আমাদের বস্তুগত অভিজ্ঞতা এই চেতনাকে জাগ্রত ও লালিত করেছিল। এই চেতনার আলোকে বস্তুজগৎকে রূপান্তরিত করার অভিলাষ ব্যক্ত হয়েছিল ছয় দফা ও এগারো দফা কর্মসূচিতে। ১৯৭১ সালের মার্চে পাকিস্তানি শাসকেরা যদি পূর্ব বাংলার মানুষের অভিপ্রায় মেনে নিয়ে তাদের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগকে ছয় দফার ভিত্তিতে দেশের সংবিধান-প্রণয়নের অধিকার ছেড়ে দিতেন, তাহলে সেদিন হয়তো মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হতো না, তবে ওই চেতনা অমলিন থাকতো। আর তা অমলিন থাকতো বলে পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে পূর্ব বাংলাকে ধরে রাখা যেতো না। পাকিস্তানি শাসকদের চণ্ডনীতি সেই অনিবার্য সংঘাত ও বিচ্ছেদকে বাস্তবায়িত করে তুলেছিল ১৯৭১ সালে। তাই পূর্ববর্তী চব্বিশ বছরের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রবণতার সঙ্গে সেদিনকার স্বাধীনতার স্পৃহা মিলে বিকাশলাভ করেছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা।

মুক্তিযুদ্ধকালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এমনকি পররাষ্ট্রমন্ত্রীও রাষ্ট্রের তিনটি নীতি বা আদর্শের কথা বারংবার বলেছিলেন— গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র। ১৯৭২ সালে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পরে বঙ্গবন্ধু এই তিন নীতির সঙ্গে যোগ করেন আরো একটি— জাতীয়তাবাদ। এই জাতীয়তাবাদের কথা পূর্বে অনুক্ত থাকলেও পূর্ব বাংলার জনগণের স্বাতন্ত্র্যবোধ ও আত্মসচেতনতা বিকাশের মূলেই ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদী ভাবের উপলব্ধি ও তার প্রসার। তাই এ কথা অনায়াসেই বলা যায় যে, ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধানে গৃহীত রাষ্ট্রপরিচালনার চারটি মূলনীতি— জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা— এ অঞ্চলের মানুষের মনে কোনো না কোনো রূপে দীর্ঘকাল ধরে লালিত হয়ে এসেছিল।

এই বিষয়টার ওপর আমি গুরুত্ব দিতে চাই এই কারণে যে, আমাদের দেশের এবং বিদেশের কোনো কোনো পণ্ডিত এমন মত প্রচার করেছেন যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যে-সরকার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, সে-সরকার যেহেতু ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং স্বাধীনতালাভের জন্যে যেহেতু ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মুখাপেক্ষী ছিলেন, সেহেতু বাংলাদেশের জনগণের সংস্রবহীন দুটি নীতি— ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্র— তাঁরা নিজেদের আদর্শ বলে প্রচার করতে একরকম বাধ্য হয়েছিলেন কিংবা এক ধরনের আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ ওই নীতিদুটি গ্রহণ করেছিলেন। এসব কথা যাঁরা বলেন, তাঁরা হয় ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ, নয়তো স্বেচ্ছাকৃতভাবে তা অবজ্ঞা করেন। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলতে গেলে তাই প্রথমেই সেই ইতিহাসের কাছে যাওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি।

এ কথা আমাদের অজানা নয় যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার আগেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে, এ নিয়ে বাদানুবাদ শুরু হয়েছিল। আসলে বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে বাঙালি মুসলমান সমাজে মাতৃভাষার প্রতি ক্রমবর্ধমান প্রীতি যে সঞ্চিত হচ্ছিল, সে-বিষয়ে উত্তর ভারতীয় মুসলমানেরা— পরবর্তীকালে পাকিস্তানি শাসকেরা— একেবারেই অবহিত ছিলেন না। বস্তুতপক্ষে এরই ফলস্বরূপ, ১৯৪৭ সালের ৩ জুন মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা-ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার কিছু তরুণ ও প্রবীণ লেখক ও বুদ্ধিজীবী পাকিস্তানের রাষ্টভাষার প্রশ্নটি উত্থাপন করেছিলেন। এঁদের অগ্রণী ছিলেন যথাক্রমে আবদুল হক ও মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। এঁরা বিশ্বাস করতেন যে, স্বাধীন পাকিস্তানে নাগরিকদের সর্ববিধ বিকাশ ঘটবে এবং অনুরূপ বিকাশের জন্যে মাতৃভাষার রাষ্ট্রীয় স্থানলাভ অপরিহার্য। তাই এঁরা চেয়েছিলেন, সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা বাংলাই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। কেউ কেউ বলেছিলেন, একাধিক রাষ্ট্রভাষা হলে বাংলার সঙ্গে উর্দুকেও সেই মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে। রাষ্ট্রপরিচালনার কূট সিদ্ধান্ত যে অমন যুক্তির ধার ধারে না, এঁরা তা বোঝেননি। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত যখন পাকিস্তান গণপরিষদের দাপ্তরিক ভাষারূপে ইংরেজি ও উর্দুর সঙ্গে বাংলা ব্যবহারের সুযোগসৃষ্টির প্রস্তাব করেন এবং প্রসঙ্গক্রমে বাংলার জন্যে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দাবি করেন, তখন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান অত্যন্ত রূঢ় ভাষায় এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে দশ কোটি মুসলমানের জন্যে এবং মুসলমানের ভাষা উর্দুই হবে দেশের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা; যাঁরা বাংলার দাবি তুলছেন, তাঁরা এই নবীন রাষ্ট্রের মুসলমান নাগরিকদের ঐক্য নষ্ট করতে চাইছেন। ভাষার গণতান্ত্রিক অধিকার অস্বীকারের এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাবের যে-প্রতিফলন এই বক্তব্যে ঘটেছিল, পূর্ব বাংলার সচেতন মানুষ তা মেনে নেয়নি। ১৯৪৮ -এর মার্চেই শুরু হয়েছিল রাষ্টভাষা-আন্দোলন, তার বিস্ময়কর পরিণতি দেখি ১৯৫২-এর ফেব্রুয়ারিতে। একুশে ফেব্রুয়ারির শহীদদের আত্মদান শুধু একমাত্র রাষ্ট্রভাষারূপে

উর্দুকে চাপিয়ে দিতেই বাধা দেয়নি, আরবি হরফে বাংলা লেখা, বাংলাভাষায় অনাবশ্যকভাবে অপ্রচলিত আরবি-ফারসি শব্দের প্রবর্তন, সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বাঙালি সংস্কৃতির বিভাজন প্রভৃতি সরকারি উদ্‌যোগকেও পর্যুদস্ত করেছিল। পাকিস্তানি শাসকদের আঘাতে আঘাতে ভাষাগত ও সংস্কৃতিগত আত্মপরিচয় সম্পর্কে আমরা সচেতন হলাম এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী ভাবধারার বিকাশ আমাদের মধ্যে ঘটলো। প্রতি বছরে একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপনের মধ্যে দিয়ে শুধু এ-ভাবধারা পুষ্ট হয়নি, বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপন, ঋতু উৎসব-পালন, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও সঙ্গীতচর্চা প্রভৃতি ক্ষেত্রে যত বেশি সরকারি বাধা এসেছে, রোমান হরফে বাংলা লেখার কিংবা বাংলা বর্ণমালা-সংস্কারের উদ্‌যোগ নিয়ে নিজেদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে আমাদের যত বেশি দূরে সরাবার চেষ্টা হয়েছে, ততই আমরা নিজেদের বাঙালিত্বকে সজোরে আঁকড়ে ধরেছি। ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের কালে উদ্ভাবিত কিছু স্লোগানের মধ্যে দিয়ে জনমানসের গভীরে প্রোথিত এই বাঙালিত্বের অসংকোচ প্রকাশলাভ ঘটেছিল : তোমার আমার ঠিকানা / পদ্মা-মেঘনা-যমুনা; জাগো জাগো বাঙালি জাগো; একটি বাংলা অক্ষর/একটি বাঙালির জীবন; জয় বাংলা। ১৯৭০-এর নির্বাচনী প্রচারের সময়ে আমরা জয় বাংলার সঙ্গে শুনেছি : আমার দেশ তোমার দেশ/ বাংলাদেশ, বাংলাদেশ; ঘূর্ণিঝড়ের পরে সকল জাতীয় দৈনিকের শিরোদেশে মুদ্রিত দেখেছি : কাঁদো, বাঙালি কাঁদো। আর ১৯৭১ সালে, অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে ডাক শুনেছি: বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো/ বাংলাদেশ স্বাধীন করো। সেদিন কাউকে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে হয়নি, বাঙালি বলতে এসব ক্ষেত্রে কাদের বুঝিয়েছে।

বাঙালিত্বের এই চেতনার সঙ্গে অসাম্প্রদায়িকতার যোগ ছিল অনিবার্য। তাই এটা খুবই স্বাভাবিক যে, ১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পরেই সচেতনভাবে অসাম্প্রদায়িকতার প্রতি গুরুত্ব আরোপিত হয়েছিল। ১৯৫২ সালে ছাত্র ইউনিয়নের জন্ম, ১৯৫৩ সালে গণতন্ত্রী দলের প্রতিষ্ঠা এবং ১৯৫৫ সালে মুসলিম ছাত্রলীগ ও আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বর্জন— এ ক্ষেত্রে একেকটা মাইলফলকের মতো। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র রচনার কালে আওয়ামী লীগের নেতারা রাষ্ট্রের ইসলামি প্রজাতন্ত্র নামকরণে আপত্তি জানান এবং দেশে যুক্ত নির্বাচন প্রথা প্রবর্তনের দাবি জানান। এই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের জন্যে যুক্ত নির্বাচন প্রথার পক্ষে প্রস্তাবও পাশ হয় পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদে। যে-দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তানের সৃষ্টি, সেই দ্বিজাতিতত্ত্বের আনুষ্ঠানিক মৃত্যু ঘটে এভাবে।

১৯৬৪ সালে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-প্রতিরোধে এখানে সকলে যে-সচেতনতার পরিচয় দিয়েছিলেন, এ-প্রসঙ্গে তা উল্লেখযোগ্য। এ কথাও স্মর্তব্য যে, সেই থেকে পাকিস্তান-আমলে আর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটতে পারেনি। ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দিয়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট যে-আইনগত কাঠামো আদেশ মান্য করা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছিলেন, তার ২০ নম্বর ধারায় বলা হয়েছিল যে, নির্বাচিত

জনপ্রতিনিধিরা যে সংবিধান প্রণয়ন করবেন, তাতে (ক) পাকিস্তান পরিচিত হবে ইসলামি প্রজাতন্ত্ররূপে, (খ) পাকিস্তান-সৃষ্টির মূলে যে-ইসলামি ভাবাদর্শ ক্রিয়াশীল ছিল, তা রক্ষিত হবে; এবং (গ) রাষ্ট্রপ্রধান হবেন একজন মুসলমান। ১৯৭০ সালের সেপ্টেম্বরে ছাত্রলীগ এই ধারা বাতিল করার আহ্বান জানায় এবং ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারিতে ছাত্র ইউনিয়ন সর্বসমক্ষে প্রস্তাব করে যে, 'রাষ্ট্র হইবে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র'।

গণতন্ত্রের জন্যে পূর্ব বাংলার আন্দোলনের ছিল দুটি প্রধান দিক : স্বায়ত্তশাসনের দাবি এবং সংসদীয় পদ্ধতির সরকারের প্রতি পক্ষপাত। ব্রিটিশ শাসনকালে মুসলিম লীগ-রাজনীতির একটা মূল ভিত্তিই ছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি। বস্তুতপক্ষে অনেক ইতিহাসবিদ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন যে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি কংগ্রেস মেনে নিলে হয়তো রাজনীতির ধারা ভারত বিভাগ পর্যন্ত গড়াতো না। কিন্তু প্রতিষ্ঠার পর থেকে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ধারণা পরিত্যাগ করে ঝুঁকলেন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনের দিকে। তাই এটা খুবই স্বাভাবিক যে, ক্ষমতাবলয়ের বাইরে অবস্থানকারী প্রাক্তন মুসলিম লীগ দলীয় রাজনীতিকেরা পাকিস্তানে সেই প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিই নতুন করে তোলেন। তার ওপরে, মুসলিম লীগ সরকারের অপশাসন, উপনির্বাচন না দেওয়া, সময়মতো সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত না করা— এসবের বিরুদ্ধে আন্দোলন ছিল পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বড় দিক। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের মতো নির্বাচিত সরকারের অপসারণে মানুষ ক্ষুব্ধ হয়েছিল। সে-ক্ষোভ প্রবল হয়েছিল দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে সামরিক শাসনের প্রবর্তনে। সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়েই জনগণের রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে, সংসদীয় পদ্ধতির সরকার-ব্যবস্থার পক্ষে এবং পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে পূর্ব বাংলায় দীর্ঘ সংগ্রামের ঐতিহ্য সূচিত হয়। সেই স্বায়ত্তশাসন-দাবির পরিণাম আমরা দেখি ছয় দফায়। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনকে বঙ্গবন্ধু অভিহিত করেন ছয় দফার পক্ষে গণভোট হিসেবে। জনসাধারণ সেদিন তাঁকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিল।

সমাজতন্ত্রের কথাটা প্রথমে সুস্পষ্টরূপে উচ্চারিত হয় ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারিতে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র-সম্পর্কিত প্রথম জাতীয় মহাসম্মেলনে। সেখানে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় যে, United States of Pakistan shall be a sovereign Socialist Republic। দেশের অর্থনৈতিক রূপ সম্পর্কে অবশ্য চিন্তাভাবনা চলে আসছিল তার বেশ আগে থেকেই। ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বরে গণতান্ত্রিক যুবলীগ বিদেশী মূলধন বাজেয়াপ্ত করার এবং বড় বড় শিল্প, ব্যাংক ও বীমা-প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের প্রস্তাব করে। ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ চায় প্রধান প্রধান শিল্পের জাতীয়করণ। ১৯৫১ সালে পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ বিদেশী মূলধন বাজেয়াপ্ত করার এবং বড় বড় শিল্প জাতীয়করণের দাবি জানায়। যুক্তফ্রন্টের একুশ দফায় পাটব্যবসা জাতীয়করণের প্রতিশ্রুতি ছিল। ন্যাশনাল আওয়ামী লীগের চোদ্দ দফায়

(১৯৬৪) এবং ছাত্র সমাজের এগারো দফায় (১৯৬৯) ব্যাংক, বীমা, পাট ও বড় শিল্প জাতীয়করণের বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। আওয়ামী লীগ সমাজতন্ত্রের কথা প্রথমে বলে বোধকরি ১৯৬৬ সালের ঘোষণাপত্রে; ১৯৬৯ সালে প্রচারিত 'নীতি ও কর্মসূচি'তে আওয়ামী লীগের লক্ষ্য হিসেবে বর্ণিত হয় 'অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকল্পে সমাজতন্ত্র কায়েম।' ১৯৭০-এ নির্বাচনী ভাষণে বঙ্গবন্ধু জাতীয়করণের মাধ্যমে অর্থনীতির প্রধান প্রধান ক্ষেত্রকে জনগণের মালিকানায় আনার প্রয়োজনীয়তার ওপরে গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৯৭১-এর ১ মার্চ করাচির *ডন* পত্রিকায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন যে, দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি-প্রতিষ্ঠায় তিনি সংকল্প-বদ্ধ।

এভাবে দেখা যাবে যে, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ সরকারের ঘোষিত আদর্শ এবং ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধানে গৃহীত রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি আরোপিত কোনো ব্যাপার ছিল না, কোনো বিদেশী হস্তক্ষেপেরও বিষয় ছিল না, তা ছিল পূর্ব বাংলার জনসাধারণের ২৪ বছরব্যাপী সংগ্রামের ফল।

আমি যে-ভাবধারার কথা বলেছি, সেটাই ছিল মূলধারা। এর বিরোধী ভাবধারার অস্তিত্ব থাকলেও তা ছিল অত্যন্ত দুর্বল। এই ভাবধারাসম্পন্ন লোকেরাই ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহযোগী হয়ে উঠেছিল। মূল ভাবধারার সঙ্গে পাকিস্তানি রাষ্ট্রীয় ভাবাদর্শের পার্থক্য যে কত বেশি ছিল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-ঘোষণার পরে বাইরের জগতের কাছেও এ-বিভেদ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। বাংলাদেশের স্বাধীনতালাভের পরে আমরা কিছু নতুন বাস্তবতার সম্মুখীন হই। তার মধ্যে প্রথম ছিল পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর আত্মপরিচয়ের বিষয়টি। পাকিস্তানের চব্বিশ বছরের ইতিহাসে নিজেদের বাঙালি সত্তা নিয়ে আমরা যে-রকম সংগ্রাম করেছিলাম, পাহাড়িদের ক্ষেত্রে অনুরূপ কিছু ঘটেনি। আমরা তাদের অনেকগুলো উপজাতি হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম। ১৯৭২ সালের সংবিধান-রচনার সময়ে গণপরিষদে মানবেন্দ্রনাথ লারমা বাংলাদেশের নাগরিকদের বাঙালি পরিচয়ে আপত্তি তোলেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে তাঁরা বাংলাদেশী, তবে বাঙালি নন; বাঙালি বললে চাকমা জাতির অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। বক্তৃতায় যদিও তিনি আরো দশটি উপজাতির উল্লেখ করেন, তবে তিনি কথা বলেন চাকমাদের পক্ষে। এখন পাহাড়ি জনসমষ্টি নিজেদের একটিমাত্র জুম্ম জাতি বলে অভিহিত করছেন। এঁরা একটি জাতি না অনেক উপজাতির সমষ্টি, তা ভিন্ন প্রশ্ন; তবে এঁদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য আমাদের স্বীকার করতে হবে। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রসঙ্গে আমরা পরে আসবো।

স্বাধীনতা-উত্তরকালে অর্থনীতির কিছু ক্ষেত্র রাষ্ট্রায়ত্ত হয় বটে, কিন্তু এ নিয়ে অন্তহীন সমালোচনা হয়েছে। লক্ষ্য সম্পর্কে আমরা সকলে হয়তো এ-বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় ছিলাম না, হয়তো উপযুক্ত লোকের হাতে কাজের ভার দেওয়া হয়নি, হয়তো এর জন্যে প্রয়োজনীয় ছিল যোগ্য কর্মীবাহিনী। মোট কথা, আমাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়নি, কাঙ্ক্ষিত ফললাভ ঘটেনি।

ধর্মনিরপেক্ষতার প্রসঙ্গেও তেমনি বলা যায় যে, এর অর্থ আমরা সকলে একরকম বুঝিনি। ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে আমি বুঝি ইহজাগতিকতা— রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের সংস্রবহীনতা। ধর্ম ব্যক্তিগত— রাষ্ট্র যেমন ধর্মের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করবে না, তেমনি কোনো ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতাও করবে না। অন্যপক্ষে, অনেকে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে বুঝেছেন, দেশে যত ধর্ম আছে, রাষ্ট্র তার মধ্যে তারতম্য করবে না, সবগুলোরই পৃষ্ঠপোষকতা করবে।

হয়তো সময় পাওয়া গেলে আলোচনা-সমালোচনা, তর্ক-বিতর্ক করে একটা জায়গায় পৌঁছোনো যেতো। কিন্তু তার আগেই বঙ্গবন্ধুকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয় এবং যাঁরা ক্ষমতায় আরোহণ করেন, তাঁরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বিপর্যস্ত করে রাষ্ট্রের চরিত্র বদলে দেওয়ার উদ্‌যোগ নেন। ক্ষমতায় থাকার জন্যে তাঁদের প্রয়োজন হয় বাংলাদেশ-বিরোধী শক্তির আনুকূল্য। একপক্ষ অবৈধ ক্ষমতাধারীদের দেন রাজনৈতিক সমর্থন, আর সেই পক্ষকে রাষ্ট্রশক্তি জোগায় সবরকম পোষকতা। এই সহযোগিতার ফল রাষ্ট্রীয় মূলনীতির পরিবর্তন।

এই শক্তি বাঙালি জাতীয়তাবাদের জায়গায় বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ প্রবর্তন করেছে। এই তত্ত্বের অভিষেকের সময়ে এর উদ্‌গাতা খোন্দকার আবদুল হামিদ এর ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন এভাবে:

> .... আমাদের জাতীয়তাকে 'বাংলাদেশী জাতীয়তা' বলাই এ্যাপ্রেপ্রিয়েট বা সঙ্গত।...
> এই জাতির রয়েছে গৌরবময় আত্মপরিচয়, নাম-নিশানা, ওয়ারিসী-উত্তরাধিকার, ঐতিহ্য-ইতিহাস, ঈমান-আমান, যবান-লিসান, শিল্প-সাহিত্য, স্থাপত্য-সঙ্গীত সবকিছু। ... এদের জীবনে ও মনোজগতে রয়েছে এমন অসংখ্য বৈশিষ্ট্য, যা সারা পৃথিবী থেকে এদের স্বাতন্ত্র্যদান করেছে— এমনকি অন্যান্য দেশের বা অঞ্চলের বাংলাভাষী ও ইসলাম-অনুসারীদের থেকেও। ইসলামের কথা বললাম এ জন্যে যে, এ দেশের ৮৫ শতাংশ লোকই মুসলিম। এই বৈশিষ্ট্যগুলোই 'বাংলাদেশী জাতীয়তা'র উপাদান। এগুলো বাকল নয়, আসল সারাংশ। আর এই সারাংশই আমাদের বাংলাদেশী জাতীয়তার আসল শক্তি, ভিত্তি ও বুনিয়াদ। (*স্পষ্টভাষী স্মরণে*, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ ২৩)।

খোন্দকার আব্দুল হামিদের বক্তব্য থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এর মূলে কাজ করেছে চল্লিশের দশকের দ্বিজাতিতত্ত্বের ধারণা। বাংলাদেশের যেসব অধিবাসী বাংলাভাষী নন, আমাদের জাতীয়তাবাদের মধ্যে তাঁদের টেনে আনার কোনো প্রয়োজনীয়তা এতে ব্যক্ত হয়নি। যা এখানে বড় হয়ে উঠেছে, তা অনুক্ত অমুসলমান ও অকথিত মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য। ১৯৭১ সালের ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিপক্ষে দ্বিজাতিতত্ত্বভিত্তিক এই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ উপস্থাপিত হয়েছিল। তাই মুক্তিযুদ্ধের কোনো প্রসঙ্গ এতে স্থান পায়নি, পাওয়ার কথা নয়। একই কারণে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রচারে ও প্রসারে মুক্তিযুদ্ধ এবং তার পূর্ববর্তী চব্বিশ বছরের সংগ্রামকে গৌণ করে তোলার আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে।

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ পাহাড়িদের কাছে টানতে পারেনি, কিন্তু বাঙালি অমুসলমানকে দূরে ঠেলেছে। অন্যদিকে বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতার

বদলে সন্নিবেশিত হয়েছে 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস'। সংবিধান রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধানের শপথ নেবেন যে অমুসলমান, মনে হয়, এতে তাঁকেও আল্লাহ্‌র ওপর আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করতে বাধ্য করা হচ্ছে। তার ওপর সংবিধানে যুক্ত হয়েছে রাষ্ট্রধর্ম-সম্পর্কিত নতুন অনুচ্ছেদ ঃ 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করা যাইবে।' এই অনুচ্ছেদের ভাষা থেকেও বোঝা যায় যে, অমুসলমান নাগরিকদের পরিণত করা হয়েছে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে। সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে উৎসাহিত করার পরিণতি আমরা দেখেছি ১৯৯০ ও ১৯৯২ সালে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের ঘটনায়। এর ফলে নির্যাতিতদের মনে এক ধরনের অনিশ্চয়তা ও অনাস্থার ভাব দেখা দিয়েছে। তাঁদের মধ্যে অনেকে বাধ্য হচ্ছেন সাম্প্রদায়িক স্বার্থের কথা ভাবতে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্যে সংসদে আসনসংরক্ষণ, এমনকি স্বতন্ত্র নির্বাচনের কথাও কেউ কেউ ভাবছেন। এতে বোঝা যায় যে, এতকাল ধরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ধর্মনিরপেক্ষতার যে-চেতনা সযত্নে গড়ে তোলা হয়েছিল, কিছু উচ্চাভিলাষী ব্যক্তির অপরিণামদর্শিতা বা স্বেচ্ছাকৃত উদ্‌যোগের ফলে তা কোন বালুরাশিতে হারিয়ে যাচ্ছে।

সংবিধান-সংশোধনীর সুযোগে ধর্ম ও রাজনীতির এমন অবাঞ্ছিত যোগ ঘটেছে যে, অনেক রাজনৈতিক গোষ্ঠী পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাবাদর্শকে অন্যভাবেও বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন। ফলে দেশে শুধু মুসলমান-অমুসলমানে পার্থক্য করা হচ্ছে না, যাঁরা নিজেদের মুসলমান বলে দাবি করেন, যেমন আহমদিয়ারা বা শিয়ারা, তাঁদেরকেও অমুসলমান ঘোষণার দাবি জানানো হয়েছে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতনের কিছু ভাগ আহমদিয়ারা পেয়েছেন— এক সময়ে পাকিস্তানে যেমন ঘটেছিল, এখন তো তাঁরা সেদেশে অমুসলমান বলে গণ্য। পাকিস্তানের অনুকরণে ব্লাসফেমি আইন-প্রবর্তনের চেষ্টা হয়েছিল, যদিও তা সফল হয়নি।

সমাজতন্ত্র কথাটি সংবিধান থেকে বর্জিত হয়নি, তবে তার ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে 'অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার' বলে। সমাজতন্ত্র সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী সাম্প্রতিক বিতর্কের পটভূমিতে মূলের 'সমাজতন্ত্র' শব্দটি হয়তো আর যথেষ্ট অর্থপূর্ণ বিবেচিত হতো না, তবে 'অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার' কথাগুলো আদৌ অর্থপূর্ণ কিনা, বিশেষত যেভাবে মুক্তবাজার-অর্থনীতির জয়ধ্বনি আমরা দিচ্ছি, তার পরিপ্রেক্ষিতে, তাতে মনে সন্দেহ জাগে। উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির কথা আমরা যতটা ভাবছি, সুষম বণ্টনের প্রশ্নটি ততটা আমাদের আলোচ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করছি না।

পাকিস্তানের সঙ্গে আরো একটি মিল আমরা অর্জন করেছি— স্বাধীনতার পরে আমাদের বেশির ভাগ সময় কেটেছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সামরিক শাসনের অধীনে। এর ফলে, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো যথাযথ বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারেনি। একদিকে গণতন্ত্রসম্মত রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিকাশসাধনে আমরা সমর্থ হইনি, অন্যদিকে একের পর এক পশ্চাৎপদ ও প্রতিক্রিয়াশীল ভাবের শিকার হয়েছি।

বাংলাদেশকে ক্ষুদে পাকিস্তান বানানোর যত চেষ্টা হয়েছে, আমাদের স্বপ্নের বাংলাদেশ-রূপে গড়ে তোলার চেষ্টা ততটা হয়নি।

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে দেশ সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেকের স্বপ্ন ছিল, দেশের মানুষের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির স্বপ্ন আমরা দেখেছিলাম— সে-মুক্তি রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক। আমরা ভেবেছিলাম, আমরা এমন একটা দেশ গড়ে তুলতে সমর্থ হবো, যেখানে সর্ববিধ সংস্কার থেকে মানুষের মুক্তি ঘটবে, শোষণ-বঞ্চনার অবসান হবে, প্রত্যেক নরনারীর সৃজনশীলতা অর্গলমুক্ত হবে। সুপ্ত প্রতিভা ও সৃজনশীলতার বিকাশের মধ্যে দিয়ে দেশে উন্মোচিত হবে নতুন নতুন দ্বার, তার অগ্রগতি ঘটবে নিত্য নবীন ক্ষেত্রে। আমাদের দুর্ভাগ্য, তা ঘটেনি। স্বপ্ন দেখার সাহসও আমরা অনেকে হারিয়ে ফেলেছি।

সে-সাহস ফিরিয়ে আনতে হবে। আবার স্বপ্ন দেখতে হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাদীপ্ত বাংলাদেশের। কী আমরা করতে চেয়েছিলাম, কী আমরা করেছি, তা যদি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়, তবে কী করতে পারিনি, তা জানতে বাকি থাকে না। আর তার সঙ্গে যদি যোগ করি, পঁচিশ বছর পরে নতুন কী আমাদের করণীয়, তাহলে তালিকা হয়তো দীর্ঘ হবে, কিন্তু লক্ষ্য হবে স্থির। জনগণ ব্যর্থ হয়নি— বারবার মূল্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করে ও গণতান্ত্রিক অধিকার সুনিশ্চিত করে তারা তার প্রমাণ দিয়েছে। তারা অসাধ্যসাধন করতে পারে। মুক্তিযুদ্ধের এই রজত জয়ন্তীতে তাই প্রয়োজন আছে তাদেরকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা মনে করিয়ে দেওয়ার। মুক্তিযুদ্ধের সে-চেতনা প্রতিষ্ঠিত ক[illegible] সংগ্রামে সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে।

শহীদেরা

১৯৭২ সালের সূচনায় যখন শরণার্থী-জীবনের সমাপ্তি টেনে দেশের মাটিতে ফিরে এলাম, তখন স্বদেশকে মনে হয়েছিল স্বজন-হারানো চিতার মতো। তখনো তো ভালো করে জনতাম না কত সংখ্যক আপনজনকে হারিয়েছি! অনেককে হারিয়েছি মুক্তিযুদ্ধের একেবারে শুরুতে, অনেককে ওই রক্তঝরা নয় মাসে, অন্তত একজনকে হারিয়েছি স্বাধীন বাংলাদেশে। তবে সবচেয়ে বেশিজনকে হারিয়েছি ১৯৭১ সালের ১৪ই ডিসেম্বরের কাছাকাছি দিনগুলোতে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ যখন বিজয়ের চূড়ান্ত লগ্নের দ্বারপ্রান্তে, দেশদ্রোহী ঘাতকেরা তখন অপহরণ করে নিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করেছে এ দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের অনেককে। তাঁদের সামগ্রিক পরিচয় এখন শহীদ বুদ্ধিজীবী বলে । তবু অনেকের কাছেই তাঁদের কারো কারো ব্যক্তিগত স্মৃতি দীপ্যমান হয়ে আছে। যেমন আমার কাছে।

সাংবাদিক সিরাজুদ্দীন হোসেন ছিলেন আমার ছেলেবেলার গৃহশিক্ষক। মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর কাছে পড়েছি প্রথমে জগন্নাথ কলেজে, পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। মুনীর চৌধুরীর কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ নিয়েছি ইংরেজি ও বাংলা সাহিত্যের, তবে তার চেয়ে অনেক বেশি করে নিয়েছি জীবনের পাঠ। জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের ইংরেজির ক্লাস নিয়েছিলেন দু-একদিন মাত্র, কিন্তু তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় যখন আমি কলেজেও ঢুকিনি তখন। এ. এন. এম. মুনীরুজ্জামানের সঙ্গে যোগ ছিল সামান্য, কিন্তু ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল গোবিন্দচন্দ্র দেবের সঙ্গে– দর্শন না পড়লেও তাঁর ছাত্রই ছিলাম, এমন কি সহকর্মী হওয়ার পরেও।

আনোয়ার পাশা ছিলেন বাংলা বিভাগে আমার সহকর্মী, রশীদুল হাসান ইংরেজি বিভাগে। বয়োজ্যেষ্ঠ সহকর্মী ছিলেন ইতিহাস বিভাগের আবুল খায়ের। মোহাম্মদ মোর্তজাও সহকর্মী ছিলেন এই অর্থে যে. তিনি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল অফিসার। আর ইতিহাস বিভাগের গিয়াসউদ্দিন আহমদ শুধু সহকর্মী ছিলেন না, খুব বড় বন্ধু ছিলেন, আমার এক ক্লাস ওপরের ছাত্র হলেও আমরা এম. এম পাশ করেছিলাম একসঙ্গে, বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিতে যোগ দিয়েছিলাম প্রায় একই সময়ে, অনেক অন্তরঙ্গতার বন্ধনে জড়িয়ে পড়েছিলাম দিনের পর দিন ধরে।

আমার এম. এ. ক্লাসের ছাত্র ছিল সাংবাদিক আ. ন. ম. গোলাম মোস্তফা আর কলেজ-শিক্ষক রফিকুল ইসলাম। অনার্স ক্লাসের ছাত্র ছিল রামকৃষ্ণ অধিকারী—পরে সেও কলেজে যোগ দেয়। সাবসিডিয়ারি ক্লাসের ছাত্র ছিল সাংবাদিক সৈয়দ নজমুল হক। কী ট্রাজেডি মানবজীবনের! এদের মতোই ছাত্র ছিল আরো একজন— আলবদরের সংগঠক হিসেবে সে অনেকের সঙ্গে ধরে নিয়ে যায় তার এবং আমার

শিক্ষক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীকে।

শহীদ সাবেরের মতো ধীসম্পন্ন মানুষের মস্তিষ্ক যে বিকৃত হয়ে গেল, এও এক অভাবনীয় ঘটনা। *সংবাদ* অফিসে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী যখন আগুন লাগিয়ে দেয় ১৯৭১ সালের ৩১শে মার্চে, শহীদ সাবের তখন সেখানেই ছিলেন, সেই আগুনেই পুড়ে নিঃশেষ হয়ে গেলেন। ছাত্রজীবনে আলীম চৌধুরী সম্পাদনা করতেন ত্রৈমাসিক *যাত্রিক*. (আহমদ কবীরের সঙ্গে),— তাতে আমার লেখা ছেপেছেন, চক্ষু-বিশেষজ্ঞ হিসেবে আমাকে চশমার ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন। ফজলে রাব্বি প্রয়োজনে আমার চিকিৎসা করেছেন, অপ্রয়োজনে কবিতার বই নিয়ে গেছেন আমার সংগ্রহ থেকে। সিভিল সার্ভিসের নুরুল আমিন খান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে ছিলেন আমার সমসাময়িক। জহির রায়হান পড়ত এক ক্লাস নিচে: প্রায় ২০ বছরের বন্ধু, মুক্তিসংগ্রামের সহকর্মী জহির যেদিন হারিয়ে যায়, সেদিনই তার সঙ্গে শেষ কথা হয়েছিল টেলিফোনে।

আর জহিরের অগ্রজ— সেই সূত্রে আমারও অগ্রজ— শহীদুল্লা কায়সার বিপ্লবী রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন অথচ নিজের কৃতিত্বের কথা উঠলে লাজুক হাসি হাসতেন। অগ্রজস্থানীয় ছিলেন পুলিশ সার্ভিসের মামুন মাহমুদও— আমার বন্ধু মইনদ্দীন মাহমুদের বড় ভাই।

বাংলা বিভাগেই আমার বছর দুই ওপরে পড়তেন মহসীন আলী দেওয়ান— বগুড়ার অধ্যাপক ও সাংবাদিক। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অধ্যাপক লুৎফর রহমানকে চিনেছিলাম তাঁর কর্মসূত্রে। সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে চিনতাম রাজনীতিবিদ মশিউর রহমান ও সায়ীদুল হাসানকে। কবি মেহেরুননেসাকে তো অনেকেই জানতাম। আর আলতাফ মাহমুদ? তাঁকে প্রথমে দেখেছি যুবলীগের পোস্টার আঁকতে, পরে গণসংগীত গাইতে, তারও পরে গানে সুর দিতে ঃ কী নির্মম অত্যাচার করে তাঁকে মেরে ফেলা হয়, সেকথা জানতে পারি তাঁর এক সহবন্দীর কাছ থেকে।

এই নয় মাসের মধ্যে আমার আত্মীয় সলিসিটর আবদুল আহাদকে হারিয়েছি। ভুল বললাম তিনিই শুধু আমার আত্মীয় নন— যাঁদের নাম বললাম, তাঁরা সবাই আমার আত্মার আত্মীয়। রক্তের চেয়ে বড় বন্ধনে আমি আবদ্ধ তাঁদের সঙ্গে। তাঁদের রক্তে যে-মাটি সিঞ্চিত, সে-মাটিই তো আমার আশ্রয়, আমার-আপনার-সকলের মাতৃভূমি।

বাঙালি

জাতিবাচক শব্দ হিসেবে বাঙালি কথাটার প্রয়োগ কত পুরোনো, তা ঠিক করে বলার উপায় নেই। বাংলা ভাষার আদি নমুনা চর্যাগীতিতে 'বঙ্গালী' শব্দটি পাওয়া যায়, তবে পণ্ডিতেরা তার এক এক রকম অর্থ করেছেন। কেউ বলেন, ওটা বঙ্গাল শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে প্রযুক্ত ; কেউ বলেন, ওতে নিরাশ্রয় নিম্নশ্রেণী বোঝানো হয়েছে। চোদ্দ শতক থেকে হয়তো আঞ্চলিক পরিচয়রূপে বাঙালি কথাটার চল হয় । তবে আঠারো শতকে ভারতচন্দ্রের কবিতায় স্পষ্টভাবে বাঙালির উল্লেখ আছে, অবশ্য পশ্চিমাদের প্রতিতুলনায়।

ইতিহাসে আমরা অন্তত তিনজনের কথা জানি যাঁরা নিজের নামের শেষে পরিচয় হিসেবে বাঙালি কথাটি ব্যবহার করেছিলেন। এঁদের প্রথম ছিলেন শেখ নূর কুতব আলম। পঞ্চদশ শতাব্দীর বাংলার দরবেশদের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হতেন। যেখানে থেকেই আসুন না কেন, তিনি পরিচিত ছিলেন শেখ নূর বাঙালি বলে। আঠোরো শতকে মুঘল সম্রাট মাহমুদ শাহের দরবারে এক সঙ্গীতজ্ঞ সাদরে বৃত হয়েছিলেন— তাঁর নাম ছিল লালা বাঙালি। উনিশ শতকে সৈয়দ আহমদ বেরিলভির এক শিষ্য ছিলেন ফেনীর সন্তান মওলানা ইনামউদ্দীন বাঙালি।

বাঙালি বলতে গর্ববোধ না করলে এঁরা কেউ নামের সঙ্গে সেই পরিচয় জুড়ে দিতেন না। তবে প্রাচীন যুগে বাঙালির অনেক অখ্যাতির কথা হিন্দুশাস্ত্রে পাওয়া যাবে। জৈনধমের প্রবর্তক মহাবীরের প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মানুষের রূঢ় আচরণের উল্লেখ জৈনগ্রন্থে পাওয়া যায়। বাঙালি সম্পর্কে সবচেয়ে কঠোর উক্তি করেছিলেন উনিশ শতকের ইংরেজ শাসক ও ইতিহাসবিদ মেকলে। তিনি লিখেছিলেন ঃ 'মোষের যেমন শিং, বাঘের যেমন থাবা, ভ্রমরের যেমন হুল, প্রাচীন গ্রীক গান-অনুযায়ী স্ত্রীলোকের যেমন সৌন্দর্য, তেমনি বাঙালির হলো প্রতারণা।'

'গোরু হইতে বাঙ্গালি কিসে অপকৃষ্ট?' — বঙ্কিমচন্দ্র জানতে চেয়েছিলেন। অবশ্য সে, বাঙালি উনিশ শতকের নব্য বাঙালি । প্রায় মেকলের ধাচে বঙ্কিমচন্দ্র সে-বাঙালির চরিত্র এঁকেছেন। বলেছেন, বিধাতা 'শৃগাল হইতে শঠতা, কুক্কুর হইতে তোষামোদ ও ভিক্ষানুরাগ, মেষ হইতে ভীরুতা, বানর হইতে অনুকরণপটুতা এবং গর্দ্দভ হইতে গর্জ্জন— এইসকল একত্র করিয়া দিঙ্‌নমণ্ডল উজ্জ্বলকারী, ভারতবর্ষের ভরসার বিষয়ীভূত এবং ভট্ট মক্ষমূলরের আদরের স্থল নব্য বাঙালিকে সমাজাকাশে উদিত করিয়াছেন।'

বঙ্কিমচন্দ্র এ কথাগুলো বলেছিলেন এক বিশেষ ধরনের বাঙালিকে মনে রেখে এবং পরবর্তীকালে নিজেই মেকলের উক্তির প্রতিবাদ করেছিলেন। সে কথায় আমরা পরে আসব। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের উপরিউদ্‌ধৃত প্রবন্ধ-প্রকাশের কিছুকাল পরে বিদ্যাসাগরের

প্রতি শ্রদ্ধানিবেদন করে রবীন্দ্রনাথ যে-প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তাতে তিনি বাঙালিকে অভিহিত করেছিলেন 'দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিক জাতি' বলে। এর আগের বাক্যগুলো সুপরিচিত হলেও বর্তমান প্রসঙ্গে উদ্ধৃতির যোগ্য ঃ

> আমরা আরম্ভ করি, শেষ করি না; আড়ম্বর করি, কাজ করি না; যাহা অনুষ্ঠান করি তাহা বিশ্বাস করি না; যাহা বিশ্বাস করি, তাহা পালন করি না; ভূরি পরিমাণ বাক্য রচনা করিতে পারি, তিল পরিমাণ আত্মত্যাগ করিতে পারি না; আমরা অহংকার দেখাইয়া পরিতৃপ্ত থাকি, যোগ্যতালাভের চেষ্টা করি না; আমরা সকল কাজেই পরের প্রত্যাশা করি, অথচ পরের ত্রুটি লইয়া আকাশ বিদীর্ণ করিতে থাকি; পরের অনুকরণে আমাদের গর্ব, পরের অনুগ্রহে আমাদের সম্মান, পরের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া আমাদের পলিটিকস এবং নিজের বাক্‌চাতুর্যে নিজের প্রতি ভক্তিবিহ্বল হইয়া উঠাই আমাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য।

বাঙালি–চরিত্রের অধিকতর নিন্দার পরিচয়স্থল সন্ধান করা অনাবশ্যক। এবারে অন্যদিকটা লক্ষ্য করা যাক।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন যে, মেকলে যেমন বাঙালির নিন্দা করেছেন, আর কোনো লেখক আর কোনো জাতি সম্পর্কে তেমন কুৎসার কথা লেখেননি। আর তা পাঠ করে শুধু যে অন্য জাতীয় ব্যক্তিই বাঙালি সম্পর্কে একটা বিশেষ ধারণার বশবর্তী হয়েছেন, তা নয়, বাঙালিরা নিজেরাও তা বিশ্বাস করে নিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেন ঃ

> উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর চরিত্র সমালোচনা করিলে কথাটা কতকটা যদি সত্য বোধ হয়, তবে বলা যাইতে পারে, বাঙ্গালীর এখন এ দুর্দ্দশা হইবার অনেক কারণ আছে। মানুষকে মারিয়া ফেলিয়া তাহাকে মরা বলিলে মিথ্যা কথা বলা হয় না। কিন্তু যে বলে যে, বাঙ্গালীর চিরকাল এই চরিত্র, বাঙ্গালী চিরকাল দুর্বল, চিরকাল ভীরু, স্ত্রীস্বভাব, তাহার মাথায় বজ্রাঘাত হউক, তাহার কথা মিথ্যা।'

ইতিহাসে বাঙালির গৌরব সন্ধান করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র পাঠান আমলের কথা বলেছেন ঃ 'পাঠান শাসনকালে বাঙ্গালীর মানসিক দীপ্তি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল।' তাঁর মতো পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে 'বাঙ্গালীর মানসিক জ্যোতিতে বাঙ্গালার যেরূপ মুখোজ্জ্বল হইয়াছিল, সেরূপ তৎপূর্বে বা তৎপরে আর কখনও হয় নাই।' তিনি বলেছেন, তখন বাংলার সম্পদ দেশের বাইরে চলে যেত না; তখন চৈতন্যের আবির্ভাব ঘটেছিল; তখন বৈষ্ণব সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল; তখন ন্যায়শাস্ত্রের নতুন বিকাশ ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'আমাদিগকে যদি কেহ বাঙালি বলিয়া অবহেলা করে আমরা বলিব, রামমোহন রায় বাঙালি ছিলেন'। বিদ্যাসাগরকে 'এই বঙ্গদেশে একক' বলে রবীন্দ্রনাথ গর্ব করেছিলেন। আমরা রবীন্দ্রনাথের গৌরব করি।

আরেকজন বিশিষ্ট লেখক বাঙালি সম্পর্কে বিশেষ গৌরবকথা লিখে গেছেন। তিনি এস. ওয়াজেদ আলি। তাঁর মতে, বিভিন্ন জাতির শত শত বৎসরের সংমিশ্রণের ফলে উদ্ভূত বাঙালি জাতির কতকগুলো সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য আছেঃ

যথাঃ বাঙালী শান্তিপ্রিয়; যুদ্ধবিগ্রহ, মারামারি, কাটাকাটি সে ভালবাসে না। বাঙালী বুদ্ধিমান, ভাবপ্রবণ, সঙ্গীত, সাহিত্য, কলাবিদ্যা প্রভৃতিকে অন্তরের সঙ্গে সে ভালবাসে; ধর্ম্মের বিষয়ে সে উদার মত পোষণ করে; গোঁড়ামি সে মোটেই পছন্দ করে না। বিদেশের আমদানী করা কৃত্রিম উত্তেজনা কখনও কখনও বাঙালীর মনে ধর্ম্মের গোঁড়ামির সৃষ্টি করে বটে, কিন্তু সে মনোভাব বেশী দিন স্থায়ী হয় না। কেননা, ধর্ম্ম বিষয়ে সঙ্কীর্ণতা বাঙালীর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। নূতনের প্রতি একটা স্বাভাবিক ভালবাসা বাঙালী তার অন্তরে পোষণ করে। নূতন ভাব, নূতন প্রথা, নূতন আদর্শকে নূতন বলেই সে বর্জ্জন করে না, পক্ষান্তরে যাচাই করে নূতনের মূল্য নিরূপণ করতে চায়। কায়িক পরিশ্রমের চেয়ে ভাবের চর্চ্চাই বাঙালীর বেশী প্রিয়। সুযোগ এবং সুবিধা পেলেই সে কাজকর্ম্ম ছেড়ে ভাবের চর্চ্চায় বিভোর হয়ে যায়। নাগরিক জীবনের চেয়ে বাঙালী পল্লীজীবন ও স্বভাব-সৌন্দর্য্যকে বেশী পছন্দ করে। বাংলার ইতিহাস ধর্ম্মের উৎকট দ্বন্দ্বে কলঙ্কিত নয়। বাংলার হিন্দু ও মুসলমান সহজে এবং স্বচ্ছন্দে পাশাপাশি বাস করে। আর গত হাজার বৎসরের ইতিহাস তাদের মধ্যে এক নিবিড় আত্মীয়তা এবং ঐক্য স্থাপন করেছে। তাদের এক জাতি বলতে এখন আর দ্বিধা বোধ হয় না। ... তারপর ইউরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে দীর্ঘ এবং ঘনিষ্ঠ সংস্রবের ফলে বাংলাদেশে এমন এক কৃষ্টি এসে দেখা দিয়েছে, যার দৃষ্টি স্বাভাবতই ভবিষ্যতের দিকে এবং বিশ্বমানবতার দিকে। পশ্চাৎমুখী সাম্প্রদায়িক কৃষ্টি সব ক্ষেত্রেই পিছে হটে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক ভাব (Democratic spirit) ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলাদেশে অনেক বেশী গভীর এবং ব্যাপক। ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে বাঙালীই গণতান্ত্রিক এবং জাতীয়তাবাদের প্রধান এবং বিশ্বস্ত সমর্থক।

এস. ওয়াজেদ আলির এই প্রেক্ষণ যদি অতিরঞ্জিত বলে মনে হয় তবে ভবিষ্যতের বাঙালির যে- চিত্র তাঁর চোখে ফুটে উঠেছিল, তা খুবই আদর্শায়িত বলে মনে হবে। তাঁর ভবিষ্যতের বাঙালি এখনো দেখা দেয়নি। কিন্তু স্বপ্ন কি তিনি একা দেখেছিলেন, অন্যেরা দেখেননি? বাঙালির ভবিষ্যতে কি অন্যদের আস্থা ছিল না?

বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন, জাতির উন্নতির জন্যে চাই বাহুবল, তবে বাহুবল মানে শারীরিক শক্তি নয়। উদ্যম ঐক্য সাহস ও অধ্যবসায়ের যোগফল হলো বাহুবল। তাঁর মতে, 'এই চারিটি বাঙ্গালির কোন কালে নাই, এজন্য বাঙ্গালির বাহুবল নাই। কিন্তু সামাজিক গতির বলে এ চারিটি বাঙ্গালি চরিত্রে সমবেত হওয়ার অসম্ভাবনা কিছুই নাই।'

কী করে তা হবে?

যদি কখন (১) বাঙ্গালির কোন জাতীয় সুখের অভিলাষ প্রবল হয়, (২) যদি বাঙ্গালি মানেরই হৃদয়ে সেই অভিলাষ প্রবল হয়, (৩) যদি সেই প্রবলতা এরূপ হয় যে, তদর্থে লোকে প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হয়, (৪) যদি সেই অভিলাষের বল স্থায়ী হয়, তবে বাঙ্গলির অবশ্য বাহুবল হইবে। বাঙ্গালির এরূপ মানসিক অবস্থা যে কখন ঘটিবে না, একথা বলিতে পারা যায় না। যে কোন সময়ে ঘটিতে পারে।

১৯৭১ সালে আমাদের দেশে তাই ঘটেছিল।

আর রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, বাঙালির উন্নতির উপায় মানুষ হওয়া। কীভাবে আমরা মানুষ হতে পারি, সে সম্পর্কে তাঁর দীর্ঘ, ব্যাপক ও গভীর বক্তব্য ছিল। তার মধ্যে একটির উল্লেখ করি। গত শতাব্দীর শেষে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন ঃ

> বাঙালির প্রতি বাঙালি কিরূপ ব্যবহার করে সেইটে গোড়ায় দেখা উচিত। কারণ, তাহারই উপর আমাদের সমস্ত শিক্ষা নির্ভর করে। ... আমাদের আজন্মকালের প্রতিনিয়ত অভ্যাস ও দৃষ্টান্তে আমাদিগকে অন্ধ বাধ্যতার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত করিয়া রাখে; তাহাতে আমরা অধীনস্থ লোকের প্রতি অত্যাচারী, সমকক্ষ লোকের প্রতি ঈর্ষান্বিত এবং উপরিস্থ লোকের নিকট ক্রীতদাস হইতে শিক্ষা করি। সেই আমাদের প্রতিমুহূর্তের শিক্ষার মধ্যে আমাদের সমস্ত ব্যক্তিগত এবং জাতীয় অসম্মানের মূল নিহিত রহিয়াছে। গুরুকে ভক্তি করিয়া ও প্রভুকে সেবা করিয়া ও মান্য লোককে যথোচিত সম্মান দিয়াও মনুষ্যমাত্রের যে একটি মনুষ্যোচিত আত্মমর্যাদা থাকা আবশ্যক তাহা রক্ষা করা যায়।

গৃহে এবং সমাজের শিক্ষায় আমরা যখন সেই মনুষ্যত্ব উপার্জন করতে পারব, তখন আমরা অন্যেরও সম্মানলাভ করব। নির্বিশেষে সকল মানুষকে ঐক্যবন্ধনে বেঁধে দেশের কাজে অগ্রসর হতে পারলে সিদ্ধি আসবেই।

১৯৯২ সালেও আমরা তা করতে পারিনি। বিশ্বাস করি, একদিন পারব।

বাংলাদেশ, বাঙালি ও বাংলাদেশী

আমরা বাঙালি না বাংলাদেশী— এ নিয়ে দেশজুড়ে একটা বিতর্ক চলছে। ১৯৭৫ সালের আগে এই বিতর্কের কোনো সম্ভাবনা কিন্তু দেখা যায়নি। বরঞ্চ আমরা খুব নিশ্চিত মনে নিজেদের বাঙালি বলে জেনে এসেছি।

১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের সময়ে আমাদের চারপাশ থেকে গগনবিদারী ধ্বনি শোনা যেতো — 'জাগো জাগো বাঙালি জাগো'। তখন তো কেউ জিজ্ঞাসা করেনি, কোন বাঙালিকে জাগতে বলছে। সবাই জানতো যে, এই বাঙালির ঠিকানা পদ্মা-মেঘনা-যমুনা। সেদিন দেশের মানুষ যাঁকে নেতা বলে জেনেছিল ও মেনেছিল, তাঁকে উপাধি দিয়েছিল বঙ্গবন্ধু— ওই উপাধির মধ্যেও জনতার নবলব্ধ আত্মপরিচয়ের প্রতিফলন ঘটেছিল। সেবারের একুশে ফেব্রুয়ারিতে মানুষের বুকে শোভা পেয়েছিল নতুন অভিজ্ঞান— বড় করে একটি বাংলা বর্ণ লিখে তার ওপরে-নিচে লেখা হয়েছিল— 'একটি বাংলা অক্ষর/একটি বাঙালীর জীবন'।

সেই ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান যখন ঘোষণা করেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ভেঙে দিয়ে সাবেক প্রদেশগুলো পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হবে, তখন অনেকেই বলেছিলেন যে, আমাদের প্রদেশের পূর্ব বাংলা নাম ফিরিয়ে আনতে হবে। কেউ কেউ বললেন, পশ্চিম পাঞ্জাবকে পাঞ্জাব বলা হবে, তাহলে পূর্ব পাকিস্তানকে বাংলা বলা হোক। ১৯৭০-এর জানুয়ারিতে বঙ্গবন্ধু বললেন, 'আমরা দাবি করছি, এ প্রদেশের নাম হবে বাংলাদেশ'। বছরের শেষে ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের মারাত্মক পরিণামের খবর দিয়ে সংবাদপত্রে ব্যানার হেডিংয়ে লেখা হয়েছিল ঃ 'বাংলার মানুষ কাঁদো'। এ কোন বাংলা, তা কাউকে বলে দিতে হয়নি।

তারপর এলো ১৯৭১। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে আকাশবাতাস বিদীর্ণ করে ধ্বনি উঠলো ঃ 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো/ বাংলাদেশ স্বাধীন করো'। তখন কেউ প্রশ্ন করেনি, বাঙালি বলতে কাদের বোঝায়, বাংলাদেশের সীমা-সরহদ কোথায়। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে যখন আমরা 'জয় বাংলা' বলেছি, তখন আমরা নিশ্চিতভাবে জানতাম, কোন বাংলার জয়ধ্বনি করছি আমরা। তখন পশ্চিম বাংলারও কেউ মনে করেনি যে, তারা এই বাংলার মধ্যে আছে। বরঞ্চ আমাদের দেখিয়ে তারা বলতো, 'এরা জয় বাংলার লোক' কিংবা জানতে চাইতো, 'আপনারা জয় বাংলা থেকে এসেছেন?'

আমাদের এই বাঙালি পরিচয় ও এই বাঙালি সত্তা ইতিহাসের একটা ধারার মধ্যে দিয়ে বয়ে এসেছে। বাঙালির ইতিহাস সুদীর্ঘকালের ইতিহাস। সে-ইতিহাসের ধারাবাহিক যে উত্তরাধিকার, তা আমরা নিজের বলে দাবি করি। সে-ইতিহাসে অনেক ভাঙাগড়া আছে, অনেক ধারার মিলন আছে। সে-ইতিহাসের মধ্যে এমন ব্যক্তিত্ব পেয়েছি বাঙালি-পরিচয়ে যিনি বিশেষভাবে ভূষিত করেছেন নিজেকে। যেমন, পনেরো

শতকে বাংলার দরবেশদের অগ্রগণ্য শেখ নূর কুতুব আলম— যেখান থেকেই তিনি এসে থাকুন না কেন— পরিচিত হয়েছিলেন শেখ নূর বাঙালি হিসেবে। যেমন, আঠারো শতকের সঙ্গীতজ্ঞ লালা বাঙালি—সম্রাট মুহম্মদ শাহের দরবারে যিনি সাদরে বৃত হয়েছিলেন। সৈয়দ আহমদ বেরিলভির খলিফা উনিশ শতকের নোয়াখালির সন্তান পরিচিত ছিলেন মওলানা ইনামউদ্দীন বাঙালি বলে। বাঙালির ইতিহাস একটা বিশেষ রূপ নিয়েছে আমাদের এই ভূখণ্ডে — ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১-এর মধ্যে। ইতিহাসের সে বিশেষ রূপই ধরা পড়েছে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ে। এই নতুন জাতিসত্তার সূচনা ১৯৫২-তে, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ভাষাপ্রীতি, আত্মত্যাগ, জাতিগত ঐক্যবোধের মধ্য দিয়ে। ১৯৫২-তে যার সূচনা, ১৯৭১-এ তার প্রতিষ্ঠা। আমাদের নতুন রাষ্ট্রীয় পরিচয়ের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে আছে আমাদের জাতিগত পরিচয়।

দুই

এই জাতিগত সত্তাকে দূরে সরিয়ে রেখে যাঁরা কেবল রাষ্ট্রীয় পরিচয়ে নিজেদের চিহ্নিত করতে চান, তাঁরা বাংলাদেশকে দেখেন একটু ভিন্নভাবে। ১৯৭১ সালের সমস্ত সংগ্রামকে তাঁরা ভুলে যেতে চান, তার পূর্ববর্তী চব্বিশ বছরের ইতিহাসকে তাঁরা গুরুত্বহীন মনে করেন। জাতিসত্তার প্রশ্নটি ঠেলে ফেলে দেওয়া যায় না, এ কথা বুঝে কেউ কেউ আবার বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ভিন্ন ব্যাখ্যা দেন। যেমন, আবুল মনসুর আহমদ। তাঁর মতে, বাংলাদেশের সৃষ্টি হচ্ছে লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবায়ন। তাঁর ভাষায়,

১. শেরে-বাংলা ফজলুল হক যা শুরু করিয়াছিলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তা সমাপ্ত করিয়াছেন। (*শেরে-বাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু,* ঢাকা, ১৯৭৩, পৃ ১)।

২. .... লাহোর প্রস্তাব স্বাধীন ভারতবর্ষকে কল্পনা করিয়াছিল দুইটি নয়, তিনটি নেশন-স্টেট হিসাবে। মুসলিম লীগ নেতারা 'থ্রি নেশন থিওরির' জায়গায় 'টু নেশন থিওরি' প্রয়োগ করার পরিণামে তাঁদের মতবাদ ভুল প্রমাণিত হইয়াছে। এই 'থ্রি নেশন স্টেট্স'-এর ভিত্তিতেই আজ ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক সুস্থতা ও স্বাভাবিকতা প্রতিষ্ঠিত হইতে যাইতেছে। (*ঐ,* পৃ ১২)।

৩. স্বয়ং প্রেসিডেন্ট ভুট্টোসহ পাকিস্তানের অনেক নেতা ও খবরের কাগজের সম্পাদকরা মাত্র কিছুদিন আগে হইতে বলা শুরু করিয়াছেন: 'বাংলাদেশের অভ্যুদয় 'পাকিস্তান কনসেপ্টে'র বিরোধী নয় বরং লাহোর প্রস্তাবের পূর্ণ রূপায়ণ।' এই সহজ কথাটাও তাঁদের অনেক আগেই উপলব্ধি করা দরকার ছিল। ....'৭১ সালে যা ঘটিয়াছিল, তা ছিল সেই 'সিভিল ওয়ার'।
(*বেশী দামে কেনা কম দামে বেচা আমাদের স্বাধীনতা,* ঢাকা, ১৯৮২, পৃ ১০২-৩)।

৪. .... পাকিস্তানের নেতারা পঁচিশ বছরে যা পারেন নাই, ভারত সরকার তাই করিয়া দিলেন : 'পাকিস্তান'কে লাহোর প্রস্তাবভিত্তিক করিয়া দিলেন। এতে পাকিস্তানেরও লাভ হইল ভারতেরও লাভ হইল। 'পাকিস্তান' লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে দুইটি স্বতন্ত্র স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হওয়ায় সেখানে সামরিক শাসনের আবশ্যকতা দূর হইল এবং সেক্যুলার ডেমোক্র্যাসির সম্ভাবনা নিশ্চিত হইল। (ঐ, পৃ. ১০৩)

৫. ... প্রকৃত অবস্থাটা এই যে বাংলাদেশের স্বাধীনতায় পাকিস্তানও ভাঙ্গে নাই, 'দ্বিজাতিতত্ত্ব'ও মিথ্যা হয় নাই। এক পাকিস্তানের জায়গায় লাহোর প্রস্তাব-মত দুই পাকিস্তান হইয়াছে। ভারত সরকার লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়নে আমাদের সাহায্য করিয়াছেন। তাঁরা আমাদের কৃতজ্ঞতার পাত্র। দুই রাষ্ট্রের নাম পাকিস্তান হয় নাই, তাতেও বিভ্রান্তির কারণ নাই। লাহোর প্রস্তাবে 'পাকিস্তান' শব্দটার উল্লেখ নাই, শুধু 'মুসলিম মেজরিটি রাষ্ট্রে'র উল্লেখ আছে। তার মানে রাষ্ট্র-নাম পরে জনগণের দ্বারাই নির্ধারিত হওয়ার কথা। পশ্চিমা জনগণ তাদের রাষ্ট্র-নাম রাখিয়াছে 'পাকিস্তান'। আমরা পূরবীরা রাখিয়াছি 'বাংলাদেশ'। এতে বিভ্রান্তির কোনও কারণ নাই।' (*আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ ৮০৮)।

উদ্‌ধৃতির আর দরকার নেই। একাধিক বইতে একাধিক ভাষায় একাধিক ভাবে আবুল মনসুর আহমদ আমাদেরকে বোঝাতে চেয়েছেন যে, ১৯৭১ সালে ভারত ও কংগ্রেস তো পাকিস্তান ভাঙেনি, বরঞ্চ লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবায়নে সাহায্য করেছেন। আমরাও পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে আসিনি, পাকিস্তানেই রয়ে গেছি। দ্বিজাতিতত্ত্ব মিথ্যা প্রমাণিত হয়নি, মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে শুধু ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র।

কিন্তু লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হবার একত্রিশ বছর পরে এবং ইংরেজ-শাসনের অবসান ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার চব্বিশ বছর পরে ভারত সরকার এবং সেদেশের কংগ্রেস দল কেন লাহোর প্রস্তাব-বাস্তবায়নের জন্যে এত ব্যগ্র হয়ে উঠলো, আবুল মনসুর আহমদ তার কোনো ব্যাখ্যা দেননি। তাছাড়াও আবুল মনসুর আহমদ যে-কথা বলেননি, তা এই যে, লাহোর প্রস্তাবে যে-পূর্ব পাকিস্তানের কল্পনা করা হয়েছিল, তার মানচিত্র আর ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মানচিত্র এক নয়; ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এ দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের যে- ধারাবাহিকতা, সে-ধারাবাহিকতায় সংঘটিত হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ; আর মুক্তিযুদ্ধের বীজ উপ্ত হয়েছিল ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনে, ১৯৪০-এর লাহোর প্রস্তাবে নয়। এতো মানুষ প্রাণ দিয়েছে, এতো নারী সম্ভ্রম হারিয়েছে— কেবল লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবায়নের জন্যে— এ কথা বড় নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের মতো শোনায়।

তিন

আবুল মনসুর আহমদ তবু নিজেকে বাঙালি বলতে দ্বিধা করেননি, সে বাঙালি যেমন ধরনেরই হোক না কেন। তিনি বলেছেন ঃ

> আমরা বাঙালীরা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলা রাষ্ট্র ও ভাষা-কৃষ্টিতে ইউনিফর্ম বাঙালী নেশন প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। ফলে বাঙালী জাতীয়তাবাদ বাংলা রাষ্ট্রের চতুঃসীমার মধ্যেই পরিবৃত। রেস্, ভাষা ও কৃষ্টিতে অবাঙালী হইয়াও বাংলা রাষ্ট্রের নাগরিকরা জাতিত্বে ও নাগরিকত্বে বাঙালী। আর রেস্, ভাষা ও কৃষ্টিতে বাঙালী হইয়াও পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীরা ভারতীয়। রাজনৈতিক জাতীয়তা পলিটিক্যাল নেশনহুড রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ডের সহিত সমায়ত বলিয়াই এটা ঘটিয়াছে। (*শেরে-বাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু*, পৃ ২৪)।

আবুর মনসুর আহমদের ভাবশিষ্য খোন্দকার আবদুল হামিদ ভার নিয়েছিলেন এই বাঙালিত্বকে নস্যাৎ করার। ১৯৭৬ সালে তিনি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের যে নতুন তত্ত্ব উপস্থাপিত করেন তাতে পরিত্যক্ত দ্বিজাতিতত্ত্বের পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টাই আমরা লক্ষ করিঃ

> 'বাঙালী' জাতীয়তা বললে মাল্টি-স্টেট ন্যাশনালিজম-এর কথা এসে পড়ে। কারণ, বাংলাদেশের বাইরেও কয়েক কোটি বাঙালী আছেন। আমরা কি সেসব বাঙালীকে বাংলাদেশের জাতির শামিল করতে পারি? জটিল আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রশ্নের ঝুঁকি না নিয়ে অমন [প্যানবেঙ্গলিজম বা সুপ্রা-ন্যাশনালিজমের] কথা আমরা কি ভাবতেও পারি? পারি না। আর তাই আমাদের জাতীয়তাকে 'বাঙালী জাতীয়তা' বলে অভিহিত করতে পারি না। করলে টেকনিক্যালি ভুল হবে, পলিটিক্যালি তা বিপজ্জনক হতে পারে।
>
> আরও কথা আছে। বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের ও অন্যান্য বাংলাভাষী অঞ্চলের মানুষ একই 'স্টক' থেকে উদ্ভূত হয়ে থাকতে পারে। উভয়ে বঙ্গভাষাভাষী হতে পারে, উভয়ে অন্নভোজী হতে পারে, উভয়ের মধ্যে আচার-আচরণেও খানিকটা মিল থাকতে পারে। কিন্তু সংস্কৃতিতে, জাতীয় সত্তায়, জাতীয় ভাবাদর্শে তারা কি এক, অভিন্ন? নিশ্চয়ই তা' নয়। বরং অনেক দিক দিয়ে ভিন্ন এবং কতক ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী।...
>
> .... এপার বাংলা ওপার বাংলার মধ্যে তেমনি চিরন্তন তফাৎ। সে প্রভেদ রগের, রক্তের, মনের, মানসের, আবেগের, অনুভূতির, ধর্মের, কর্মের, এবাদৎ-বন্দেগির, নামের, নিশানের, ঐতিহ্যের, উত্তরাধিকারের, খোরাকের, পোশাকের, আদবের, লেহাজের, কায়দা-কানুনের, জীবনবোধের, জীবনধারার, জীবন-দর্শনের এবং জীবন-সাধনার। হৃদয়ানুভূতির নিবিড় বন্ধন দু'য়ের মধ্যে চিরকাল অবর্তমান। এমন কি উভয় বাংলার ভাষা মূলত একটা হলেও বড়লোকদের বৈঠকখানা, বিদগ্ধদের সাহিত্য-অঙ্গনের বাইরে জনগণের যে ভাষা তা যবানে-লিসানে, মুখরেজে-তালাফফুজে পর্যন্ত আলাদা।......
>
> কাজেই 'বাঙালী জাতীয়তা' কথাটা শুধু রাজনৈতিক দিক থেকে ভ্রান্ত নয়, ঐতিহাসিক দিক থেকেও অবাস্তব। এমনকি রাজনৈতিক দর্শন হিসাবেও এর অসারতা স্বপ্রমাণিত। 'বাঙালি জাতীয়তা' তাই মিস্‌নোমার। আমাদের জাতীয়তাকে 'বাংলাদেশী জাতীয়তা' বলাই এ্যাপ্রোপ্রিয়েট বা সঙ্গত ।.......
>
> এই জাতির রয়েছে গৌরবময় আত্মপরিচয়, নাম-নিশানা-ওয়ারিসী উত্তরাধিকার, ঐতিহ্য-ইতিহাস, ঈমান-আমান, যবান-লিসান, শিল্প-সাহিত্য, স্থাপত্য-সঙ্গীত সবকিছু। ... এদের জীবনে ও মনোজগতে রয়েছে এমন অসংখ্য বৈশিষ্ট্য, যা সারা পৃথিবী থেকে এদের স্বাতন্ত্র্যদান করেছে— এমনকি অন্যান্য দেশের বা অঞ্চলের বাংলাভাষী ও ইসলাম-অনুসারীদের থেকেও। ইসলামের কথা বললাম, এ জন্যে যে এ দেশের ৮৫ শতাংশ লোকই মুসলিম। এই বৈশিষ্ট্যগুলোই 'বাংলাদেশী জাতীয়তার' উপাদান। এগুলি বাকল নয়, আসল সারাংশ। আর এই সারাংশই আমাদের বাংলাদেশী জাতীয়তার আসল শক্তি, ভিত্তি ও বুনিয়াদ। (খোন্দকার আবদুল হামিদ, *স্পষ্টভাষী স্মরণে*, ঢাকা, ১৯৮৪, পৃ ২১-২৩)।

এ কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, এই বক্তব্যের মূলে কাজ করেছে দ্বিজাতিতত্ত্বের ধারণা। বাংলাদেশের যেসব অধিবাসী বাংলাভাষী নন, আমাদের জাতীয়তাবাদের মধ্যে তাঁদের টেনে আনার কোনো প্রয়োজনীয়তা এতে ব্যক্ত হয়নি। যা এখানে বড় হয়ে উঠেছে, তা হলো অনুক্ত হিন্দু ও অকথিত মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য। ১৯৭১ সালের ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিপক্ষে দ্বিজাতিতত্ত্বভিত্তিক এই বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ উপস্থাপিত হয়েছিল। তাই মুক্তিযুদ্ধের কোনো প্রসঙ্গ এতে স্থান পায়নি, পাওয়ার কথা নয়। একই কারণে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের প্রচার ও প্রসারে মুক্তিযুদ্ধের কথাটা গৌণ করে তোলার আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রব্যবস্থায় হয়তো খোন্দকার আবদুল হামিদের এই মনোভাব কার্যকর হতে যাচ্ছে। সেক্ষেত্রে আমাদের বুঝতে হবে যে, নিজেদের বাঙালি সত্তা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম পাকিস্তানি দুঃশাসনের অবসানের পরেও শেষ হয়নি।

চার

আবুল মনসুর আহমদ ও খোন্দকার আবদুল হামিদের কথা যদিও ওপরে আলোচিত হলো, তবু এ কথা বলা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশ, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে অনেকেই উল্লেখযোগ্য বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। যেমন, অ্যান্থনী মাসকারেনহাস মনে করেন যে, বাংলাদেশের অধিবাসীদের বাঙালি বলে অভিহিত করে শেখ মুজিবুর রহমান ভারতের বিরক্তি উৎপাদন করেছিলেন, কেননা এই বাঙালি জাতীয়তাবাদের অবাঞ্ছিত সংশ্লেষ পশ্চিমবঙ্গে দেখা যেতে পারে ভবিষ্যতে, এমন আশঙ্কা ছিল, আর তাই জিয়াউর রহমান যখন নাগরিকদের পরিচয় স্থির করলেন বাংলাদেশী বলে, ভারত তা স্বাগত জানাল (Anthony Mascarenhas, *Bangladesh : A Legacy of Blood*, London, 1986, p 125)।

নিজের বক্তব্যের সমর্থনে মাসকারেনহাস কোনো প্রমাণ দেননি ; দিলেও তাতে বাঙালি জাতীয়তাবাদের যৌক্তিকতা বা ভ্রান্তি প্রতিপন্ন হতো না। তবে এটা বোঝা যায় যে, বাংলাভাষী ভারতীয়দের কথা চিন্তা করে অথবা ভারতের শাসকদের প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে যাঁরা বাংলাদেশের নাগরিকদের বাঙালি বলতে কুণ্ঠাবোধ করেন, তিনি তাঁদের একজন।

বদরুদ্দীন উমরের কাছে এই বিতর্ক বাহুল্যমাত্র। বাংলাদেশের অধিবাসীদের একটি জাতি বলে তিনি স্বীকার করেন না, অবিভক্ত বাংলার ইতিহাস-ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে তেমন স্বীকৃতিদান তিনি সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি-সঞ্জাত বলে মনে করেন এবং সেই কারণে বাংলাদেশকে একটি জাতীয় রাষ্ট্ররূপে মেনে নিতে তাঁর আপত্তি রয়েছে ('বাঙালী জাতীয়তাবাদের ভিত্তি', মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর-সম্পাদিত *জাতীয়তাবাদ-বিতর্ক*, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ ৯২-৯৫)।

এ-প্রসঙ্গে মাত্র দুটি কথা বলার আছে। প্রথমত, বাংলাদেশের মানুষের পক্ষে নিজস্ব রাষ্ট্রগঠনের আকাঙ্ক্ষা— একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্বতন্ত্র পরিচয়ে একত্র বসবাসের

ইচ্ছা— তুচ্ছ করার মতো বিষয় নয়। দুই জার্মানির পুনরেকত্রীকরণে যেমন, তেমনি বাংলাভাষী এলাকার দুই অংশের মানুষের পৃথক হয়ে থাকার মূলে একটিই সাদৃশ্য আছে, তা হলো জনগণের ইচ্ছাশক্তি। জাতিগঠনের ক্ষেত্রে সেটা বড় উপাদান এবং বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সে-ইচ্ছা একটা রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে রূপায়িত হয়েছে বলে তার গুরুত্ব আরো বেশি। দ্বিতীয়ত, ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১-এর মধ্যে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ ও পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে পার্থক্য ছিল নিশ্চয়। সে পার্থক্য অগ্রাহ্য করার মতো নয়। একটা পুরো প্রজন্মই পৃথক অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়ে গেল ইতিহাসের ধারায়, বাংলার পূর্ব ও পশ্চিম অংশ পরস্পরকে ভালো করে জানতেও পারলো না এ-সময়ে— এ অভিজ্ঞতা মুছে ফেলার নয়।

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেও তার স্বাধীনতাকে স্বীকার করতে কুণ্ঠিত আহমদ শরীফ। তিনি বলেন :

> .... বাঙালিরা ১৯৪৭ সালের চৌদ্দই আগস্ট থেকেই স্বাধীন ও রাষ্ট্রের সার্বভৌম মালিক। যৌথ পরিবার ভেঙ্গে ভাইরা যখন পৃথগন্ন হয় তখন তাকে স্বাধীনতা বলে না, ...। স্বাধীন বাংলাদেশও তার অপর শরিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে ১৯৭১ সনে শোষণমুক্তির লক্ষ্যে। একে অধীনতা থেকে মুক্তি বলে আখ্যাত করলে জাতির ও ইতিহাসের অবমাননা হয় মাত্র। পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাংলাদেশ ও বাঙালী পরাধীন ছিল ভাবলে বলতে হবে, ১৯৪৭ সনে বাঙালী মুসলমানরা স্বেচ্ছায় ভিন্ন জাতির দাসত্ব বরণ করেছিল। অতএব ১৯৭১ সনে বাঙালীরা বাংলাদেশকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৭১ সনের সংগ্রাম ছিল প্রবল দলের বা শরিকের শাসন ও শোষণ থেকে মুক্তিলক্ষ্যে সংগ্রাম। কোন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের জনগণ যদি স্বদেশী ও স্বধর্মী স্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে জনগণের অধিকার আদায় করে বা জনগণের প্রতিনিধি রূপে কৃষাণ মজুর সরকার গঠন করে তাকে স্বাধীনতা অর্জন বলা যাবে না। .... সুতরাং ১৯৭১ সনের যুদ্ধ ছিল পৃথক বা বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্যে যুদ্ধ । এ সংগ্রামের তাত্ত্বিক ও তাথ্যিক তাৎপর্য ও ফল এক কথায় দেশকালহীন মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ঐক্য বা জাতীয়তা থেকে অধিকাংশ বাঙালী মুসলমানের দৈশিক জাতীয়তা চেতনায় তথা বাঙালীত্বে উত্তরণ। এ-ও সত্য যে, দ্বিজাতিতত্ত্ব ভিত্তিক পাকিস্তান না হলে বাঙালী জাতীয়তা ভিত্তিক বাংলাদেশও সম্ভব হত না। অতএব ২৬শে মার্চ কিংবা ১৬ই ডিসেম্বর নাজাত দিবস হতে পারে, কোন সংজ্ঞাতেই আজাদী হিসেবে স্মরণ্য নয়। (*কালের দর্পণে স্বদেশ*, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ ২২-২৩)।

আহমদ শরীফকে বোঝা খুব সহজ নয়। উপরের উদ্‌ধৃতি থেকে মনে হয়, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে তিনি বড়জোর বিচ্ছিন্নতাবাদ বলতে রাজি — তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। বিচ্ছিন্নতাবাদ আর স্বাধীনতা-সংগ্রামের সীমানা কোথায়, তা নিয়ে বড় বড় পণ্ডিতের মতানৈক্য আছে। এ নিয়ে তর্ক করা চলে, কিন্তু কাউকে দোষ দেওয়া চলে না। আরো কেউ কেউ বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রয়াস হিসেবে দেখেছেন। তবে

আহমদ শরীফ আবার এই বিচ্ছিন্নতাবাদীদেরকে পূর্বতন সার্বভৌম রাষ্ট্রের মালিক বলেও অভিহিত করেন। সার্বভৌম রাষ্ট্রের মালিকেরা আবার স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চাইবে কেন, এই প্রশ্নের সদুত্তর তাঁর লেখায় পাওয়া যায় না। ১৯৭১-এর পাকিস্তানকে তিনি শুধু স্বাধীন ও স্বদেশী বলে বিবেচনা করেননি, তার স্বধর্মী বলে পরিচয়টা বেশ বড় করে তুলেছেন। আবার তারপরই তিনি বলেছেন যে, বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে মুসলিম জাতীয়তাবাদী ভাবধারা থেকে আমাদের উত্তরণ ঘটেছে বাঙালি জাতীয়তাবাদে। তবে সে উত্তরণের দিনটিকে তিনি গণ্য করেন নাজাত দিবস হিসাবে।

বাঙালি জাতীয়তাবাদের সঙ্গে নাজাতের সম্পর্ক নিয়ে ভাবিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তার চেয়েও ভাবিত হই আহমদ শরীফের সাম্প্রতিক বক্তব্যে। তিনি ঘোষণা করেছেন যে, '১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টে এদেশের মুসলমানেরা স্বাধীন হয়েছে আর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে স্বাধীন হয়েছে এদেশের হিন্দুরা।' (*সংবাদ*, ২৩ এপ্রিল ১৯৯১)। এই সিদ্ধান্তের সমর্থনে তিনি যা বলেছেন, তার যৌক্তিকতা আমাদের বোধগম্য নয়, এ কথা স্বীকার করতে বাধা নেই।

পাকিস্তান না হলে বাংলাদেশ হতো না, এ কথা আমরা এতবার শুনেছি যে, এ সম্পর্কে এক-আধটা কথা না বলে থাকা যাচ্ছে না। পি. জি. ওডহাউজের *Big Money* উপন্যাসে একটি চরিত্র ছিল, সে সবকিছুর মূল খুঁজতো। মুখ-দেখা আয়নায় লিপস্টিকের দাগ মুছতে মুছতে সে চিন্তা করছিল এভাবে— লিপস্টিক আবিষ্কৃত না হলে তাকে এটা মুছতে হতো না ; যুদ্ধের সময়ে লিপস্টিকের চল হয় তাই যুদ্ধ না হলে লিপস্টিক বের হতো না ; সারায়েভোয় রাজকুমার নিহত না হলে যুদ্ধ লাগতো না; ওই রাজকুমারের হত্যাকারী না জন্মালে কুমার নিহত হতেন না ; হত্যাকারীর পিতামাতার পরস্পর সাক্ষাৎ না ঘটলে তার জন্ম হতো না। পাকিস্তান না হলে বাংলাদেশ হতো না, এ কথা সত্য। তেমনি ইরেজরা এ দেশে না এলে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হতো না ; মুঘলদের কাছ থেকে ইংরেজ কোম্পানি ব্যবসা ও লুঠ করার সনদ পেয়েছিল, তাই মুঘলরা না এলে ইংরেজ আসতো না। এভাবে ক্রমান্বয়ে পেছন দিকে গিয়ে ইতিহাসের কতকগুলো সত্যের কার্য-কারণ নির্দেশ করা যায়, কিন্তু তাতে সেসব সত্যের তাৎপর্য নির্ণীত হয় না। পাকিস্তান না হলে বাংলাদেশ হতো না— তা সত্য, কিন্তু এ ক্ষেত্রে যা তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাপার, তা এই যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ও দার্শনিক তত্ত্ব অস্বীকার করতে পেরেছিলেন বলেই বাংলাদেশের অভ্যুদয় সম্ভবপর হয়েছিল। সুতরাং কেবল পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠার মধ্যে বাংলাদেশের উন্মেষের সম্ভাবনা না দেখে পাকিস্তানের বিলয়ের মধ্যেই বাংলাদেশের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করা অনেক বেশি সমীচীন। সম্পূর্ণ অন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বাংলাদেশের জাতীয় চেতনার ব্যাখ্যা দিয়েছেন মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান। তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে আমার ভাবনার যেমন মিল আছে, তেমনি তার মধ্যে অন্যদের উত্থাপিত কিছু কিছু প্রশ্নেরও জবাব পাওয়া যাবে। তিনি বলেন :

ইতিহাসের নানান যোগ-বিয়োগ শেষে বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎ আজ বাংলাদেশের নাগরিকদের ওপর বর্তেছে। মুক্তি-আন্দোলনের সময় 'জাগো জাগো বাঙালী জাগো' বলে যে

শ্লোগান দেওয়া হয় তা বাঙালীর ইতিহাসে পূর্বে কোনোদিন ধ্বনিত হয়নি। বাংলাদেশের এই চেতনা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের চেতনা থেকে স্বতন্ত্র, ১৯৪৬-৪৭-এর মৃতবৎস অখণ্ড সার্বভৌম বঙ্গের চেতনা হতেও স্বতন্ত্র। এর জন্মের সূত্রপাত হয়েছে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, যার মধ্যে অবশ্য পুরানো দিনের নানা রেশ ওতপ্রোতভাবে মিশে রয়েছে। (*গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ*, দ্বি-স ; ঢাকা, ১৯৮৯, পৃ ১৬৭)।

পাকিস্তানি ইকরাম সেহগল সম্প্রতি যে-প্রবন্ধ লিখেছেন তার শিরোনাম 'Pakistan and Bangladesh—Two countries, one nation' (*The Nation*, 26 March 1991)। স্বভাবতই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, এ কোন 'ওয়ান নেশন'? পাকিস্তানিরা কি বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত হতে সম্মত হয়েছে, না আমরা পাকিস্তানি জাতিসত্তার মধ্যে আত্মবিলোপ করতে চলেছি? আজ যাঁরা এই একজাতির কথা বলতে সাহস পেয়েছেন, ১৯৭৫ সালে তাঁরাই —মাহমুদ আলীর মতো — পাকিস্তানের পুনরেকত্রীকরণের স্বপ্নের কথা ব্যক্ত করেছিলেন। আমাদের দেশে যেসব নেতা সব সময়ে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের কথা বলেন, তাঁরা আমাদের বোঝাতে চান যে, ভারতের থেকে আমাদের সার্বভৌমত্ব বিপন্ন এবং সেই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হবে। পাকিস্তান থেকে যে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব আমরা বহু মূল্যে ছিনিয়ে এনেছিলাম, তা পাকিস্তানের কাছ থেকেও রক্ষা করা প্রয়োজন। কিন্তু সেকথা তাঁরা বলেন না এবং এই না বলার যে কারণ আছে, তা বুঝতে আমাদের বেগ পেতে হয় না। তেমনি ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধকে যাঁরা ভাইয়ে-ভাইয়ে বিবাদ হিসেবে দেখেন, তাঁরা ভুলে যান যে, সেদিন ভাই কেবল ভাইকে হত্যা করেনি, বোনকেও ধর্ষণ করেছিল। সেকথা যদি আমরা ভুলে যাই, সেই বেদনার ভার যদি আমরা বহন করতে না পারি, তবে স্বাধীন জাতি হিসেবে আমাদের বিকাশ ব্যাহত হবে। ইতিহাসের কী কষ্টকর পথ বেয়ে আজ আমরা এখানে এসে পৌঁছেছি, তা স্মরণে রাখতে হবে। সেই স্মৃতি আমাদের জাতীয়তাবাদ, ঐক্যচেতনা, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে ভিত্তি দেবে।

ইতিহাসের শিক্ষা

ইতিহাসের শিক্ষা কি তাহলে এই যে, কেউ ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় না? গত কিছুদিন ধরে প্রথমে ভারতে এবং তারপরে বাংলাদেশে যেসব ঘটনা ঘটছে, বিবেকবান ব্যক্তিমাত্রের পক্ষেই তা মর্মান্তিক। আমরা কোন যুগে বাস করছি, সভ্যতার কোন স্তরে আছি, হৃদয়হীনতার কোন গহ্বরে নেমে গেছি, মনুষ্যত্বের মহিমা কোন মন্ত্রবলে খুইয়ে বসে আছি— তা আর বোঝার উপায় নেই। ১৯২৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়ে নজরুল ইসলাম *গণবাণী* পত্রিকায় লিখেছিলেন 'মন্দির ও মসজিদ' প্রবন্ধ। সেদিনও তিনি মসজিদের গম্বুজ ও মন্দিরের চূড়া ভাঙার খবর দিয়েছিলেন, জানতে চেয়েছিলেন— মন্দির-মসজিদের ললাটে মানুষের রক্তে লেখা কলঙ্করেখা কোন বীর এসে মুছিয়ে দেবে? এই ছেষট্টি বছরে বীরের আবির্ভাব যে ঘটেনি, তা নয়, কিন্তু দুর্বৃত্তের আস্ফালন কিছুমাত্র কমেনি। আমরা ভেবেছিলাম, কমেছে। কিন্তু সে আমাদেরই ভ্রান্তি।

ধর্ম নিয়ে এই যে রক্তক্ষয় তার জন্যে আমরা এক সময়ে দায়ী করেছি সাম্রাজ্যবাদকে। কথাটা যে সম্পূর্ণ সত্য নয়, হয়তো সে-কথা জেনেও বলেছি। দোষ দেওয়ার মতো ঘাড় পেলে নিজের দায়িত্ব স্বীকার করবো কেন? ইংরেজ এ দেশে আসার বহু আগে বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণে বৈষ্ণব-মুসলমানে দ্বন্দ্বসংঘাতের খবর পাই। ইংরেজ শাসনকালে তার মাত্রা বহুগুণে বেড়েছিল বটে, কিন্তু তার একমাত্র কারণ কেবল শাসকদের কারসাজি নয়। বীজটা আমাদের মধ্যেই ছিল। নানা ঘটনার, নানা প্ররোচনার আনুকূল্য পেয়ে তা সভ্যতার সীমা ভেদ করে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। আমরা কখনো ঐক্যবন্ধনে সবাইকে বেঁধে এর হাত থেকে রক্ষা পেতে চেয়েছি, কখনো স্বাতন্ত্র্যে সমাধান খুঁজেছি। কোনোটাই কাজে দেয়নি। ১৯২৬-এর পুনরাবৃত্তি হয়েছে ১৯৪৬-এ, ১৯৪৭-এর পুনরাবির্ভাব ঘটেছে ১৯৫০-এ, ১৯৬৪-এর প্রতিবিম্ব দেখা দিয়েছে ১৯৯০-তে। ইতিহাসের এই লজ্জাজনক অধ্যায় পার হতে হতে প্রতিবারই মনে হয়েছে, এই শেষবার— এবারের ঘটনা থেকে শিক্ষা নেবো, এমনটি আর হবে না। হয়েছে তারপরও। রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতায় এ কলুষ দূর হয়নি, মহাপুরুষদের বাণীতে হয়নি, মানুষের চরম আত্মত্যাগেও হয়নি। অনেক সময়ে আমরা ভেবেছি, শিক্ষাদীক্ষার অভাবই এর মূল। জীবনযাত্রার মান উন্নত হলে এ রকম আর ঘটবে না। সভ্য ও শিক্ষিত, জীবনযাত্রার মানে উন্নত ইউরোপের দিকে তাকিয়ে এ কথা আর সত্য বলে মনে হয় না। ইনকুইজিশনের ইতিহাস সেখানে কে না পড়েছে? ধর্মকলহে যে রক্তগঙ্গা বয়ে গেছে ওই মহাদেশে, তার বৃত্তান্ত বহু মানুষেরই জানা। তবু বছরের পর বছর ধরে কী নিদারুণ নরহত্যা ঘটছে উত্তর আয়ারল্যান্ডে! যুগোশ্লাভিয়ায় ধর্মবিদ্বেষ জাতিবিদ্বেষ এতদিন কেমন করে যেন চাপা পড়েছিল, হঠাৎ করে যখন তার বদ্ধমুখ খুলে গেল, তখন বীভৎসতার কী নগ্ন পরিচয় আমাদের চোখের সামনে অনাবৃত হচ্ছে প্রতিদিন! বর্ণবাদ কী কুশ্রী চেহারা ধারণ করেছে আফ্রিকায় ! অদিবাসীদের ওপর কী নির্যাতন

ঘটে গেছে আমেরিকায়, অস্ট্রেলিয়ায়! শিক্ষাদীক্ষা কিছুই কাজে লাগেনি। জ্ঞানের পেয়ালা ঠোঁট পর্যন্ত ঠেকিয়েছি আমরা, অন্তরে কিছুই নিইনি।

সমগ্র অন্তর মথিত করে আজ বেদনার ধ্বনি উঠছে : মুক্তি কোথায়, মুক্তি কোথায় ওরে!

শুধু সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নে নয়, সব প্রশ্নেই যেন আমরা অবহেলা করেছি ইতিহাসের শিক্ষা। এই বাংলাদেশের কথাই মনে করি না কেন। যা যা আমরা পরিহার করতে চেয়েছি, তার সবই যেন ফিরে এসেছে বারে বারে আরো অধিক শক্তি সঞ্চয় করে। দু-দুবার সামরিক শাসনের অধীনে থাকার তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করে, রক্ত দিয়ে সমরনায়কের পতন ঘটিয়ে, আবার সামরিক শাসনকে অভিনন্দন জানাবে এ দেশের মানুষ, এ কথা কে ভাবতে পেরেছিল? চব্বিশ বছর ধরে ধর্মের নামে শোষিত হওয়ার পরে আবার রাজনৈতিক জীবনে ধর্ম ফিরে আসবে সদম্ভে, তাই বা কে ভেবেছিল? যে-বাঙালি পরিচয়ের গর্ব একদিন আত্মাহুতির প্রেরণা দিয়েছিল, যে-আত্মাহুতির সম্মান বছরে বছরে দিয়ে এসেছি আমরা, হঠাৎ তার কথা ভুলে বাঙালি না হতে চাইবার প্রয়াসে তরুণ-তরুণীরা কেমন করে আত্মহারা হয়ে যায়, তা বুঝে ওঠা দায়। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে দেখা-হওয়া-মাত্র যার প্রাণসংহার করবো বলে মনে হয়েছিল, যুদ্ধশেষে দুবাহু বাড়িয়ে তাকে আলিঙ্গন করা কীভাবে সম্ভব, তাও মাথায় আসে না। একবার রাষ্ট্রপতি-পদ্ধতিকে খারাপ বললাম, তারপর তা টিকিয়ে রাখলাম ষোল বছর ধরে। বিশেষ ক্ষমতা আইন জারি করার জন্যে দোষারোপ করলাম, তারপর আঠারো বছরেও কেউ তার বিনাশসাধন করলাম না। বেতার-টেলিভিশনের স্বায়ত্তশাসনের কথা বললাম, তারপর তা যখন আয়ত্তে এলো, তখন স্বদলের স্বার্থ ছাড়া আর কিছু মনে রাখতে পারলাম না। সংবাদক্ষেত্র সম্পর্কে অনেক বড় বড় কথা বললাম, তারপর বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ করলাম এমনভাবে যে সামান্যতম মতান্তর যেখানে, সেখানে আর ন্যায্য পাওনাটুকু পৌঁছালো না।

কী বিচিত্র এই দেশ! মানুষ একবার আশা করে, পরক্ষণে আশাহত হয়। আশাভঙ্গের বেদনা কখনো চুপ করে মেনে নেয়, কখনো গর্জে উঠে প্রতিবাদ জানায়। রাজপথে রক্ত ঢেলে দেয় অকাতরে। তারপর আবার আশায় বুক বাঁধে— যদি বেঁচে থাকে। গর্জমান নেতা রাতের অন্ধকারে আনুগত্য বদলায়, একদিনের বিপ্লবী আরেকদিনে সামরিক একনায়কের যাত্রাপথের ধুলো ঝেড়ে দিতে চায়, সে কাজ না পেলে চরমতম প্রতিক্রিয়াশীলের সঙ্গে হাত মেলায়। এখানে বিচার চাইলে দণ্ডিত হবার ভয় থাকে, শুধু কবিতা লেখার জন্য লাঞ্ছনা সইতে হয়— স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে আক্ষরিক অর্থে পথে বসতে হয়। যে-মসজিদে বিশ্বাসী আত্মসমর্পণ করতে যায় প্রতিপালকের কাছে, সে-মসজিদ হয়ে ওঠে সহিংস প্ররোচনার ক্ষেত্র। যে-বিদ্যাপীঠ জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র, সেখানে অস্ত্রের সমারোহ। কী করে অবলীলায় সতীর্থকে হত্যা করে যায় একজন

তরুণ— তার হাত কাঁপে না, অনুশোচনা জাগে না, জীবনের জন্যে আকর্ষণবোধ হয় না!

তথ্য দিয়ে বোঝানো সম্ভব, এমন হয়, বহু দেশে হয়। নিউইয়র্কের পুলিশ আর অধিবাসীর অনুপাত নিন, তারপর ক্রাইম ফিগার দেখুন; ঢাকার পুলিশ আর জনসংখ্যার হিসাব নিন, তারপর অপরাধের সংখ্যা দেখুন। আমরা অনেক ভালো আছি। জানেন তো, এমন দেশ আছে যেখানে সরকারের বিরোধিতা করলে লোক উধাও হয়ে যায়, আমাদের দেশে বড়জোর শত্রু আইনে ধরে রাখে।

দেখুন, ওদেশে সহস্রাধিক লোক নিহত হয়েছে দাঙ্গায়, আমরা বড় জোর শতাধিক মেরেছি— আমাদের সংযমের প্রশংসা না করে উপায় নেই।

আমি জানতে চাই না, শুনতে চাই না। কেননা আমি কখনো বুঝতে পারবো না। আমার অন্তরে যেখানটায় ক্ষত, তার বাইরেটায়ও সেখানে আঘাত। আমি শুধু বলতে পারি, আমার যা-কিছু মন্দ তা কাউকে দেবো না— না দেশকে, না বিশ্বকে। আমার যেটুকু ভালো সেটুকু যেন দিতে পারি। ইতিহাস থেকে শিক্ষা না হয় নাই নিলাম, ইতিহাসকে কি আমার দেওয়ার কিছুই নেই?

সাম্প্রদায়িকতার প্রত্যাবর্তন

যতোই অপ্রিয় হোক, কথাটা এখন আর অস্বীকার করার উপায় নেই। আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িকতা ফিরে এসেছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় খুব বড় করে বলেছিলাম, বাংলাদেশ থেকে চিরকালের জন্যে সাম্প্রদায়িকতার উচ্ছেদ হয়ে গেছে। বিশ্বাস করেছিলাম বলেই বলেছিলাম। আজ সে-বিশ্বাসের ভিত্তি নড়ে গেলেও তখন তা খুব শক্ত ছিল। ১৯৬৪ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত এ দেশে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার কোনো ঘটনা ঘটেনি— এমন কি, ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায়ও নয়। বরঞ্চ, ১৯৫০ সালের পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ঘটে ১৯৬৪ সালে, চোদ্দ বছর পরে। সে-তুলনায় সাত বছর খুব বেশিদিনের ব্যবধান নয়। ১৯৬৪ সালে বড় ব্যাপার যা ঘটেছিল, তা সাম্প্রদায়িকতার প্রতিরোধ— স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং সংগঠিতভাবে। যেদিন দাঙ্গা শুরু হয়, সেদিনই মানিক মিয়া, জহুর হোসেন চৌধুরী ও আবদুস সালামের সম্মিলিত উদ্‌যোগের ফলে, পরদিন প্রতিটি দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠার শীর্ষদেশ জুড়ে আবেদন জানানো হয়েছিল : 'পূর্ব পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও'। রুখে দাঁড়িয়েছিল দেশ। স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন আমীর হোসেন চৌধুরী। তিনি ছিলেন বেগম রোকেয়ার বোন হোমায়রার একমাত্র পুত্র, নজরুল ইসলামের কবিতার ইংরেজি অনুবাদক এবং রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও মুকুন্দ দাস সম্পর্কে ইরেজিতে প্রবন্ধ-লেখক। নবাবপুরের সন্নিহিত একটি রাস্তায় তাঁর বাড়ি এবং রীমা কেমিক্যালস নামে রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানা ছিল। দাঙ্গাকারীদের হাত থেকে প্রতিবেশী এক হিন্দু পরিবারকে রক্ষা করতে যেয়ে ৫৫ বছর বয়সে তিনি প্রাণদান করেন। জেনে-শুনে বিপদের এই ঝুঁকি নিয়ে তিনি দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন। ঢাকার সব সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংগঠন সেদিন এগিয়ে এসেছিল— দাঙ্গার প্রতিরোধে, উপদ্রুতদের সাহায্যে, মানবতার সেবায়। বস্তুত দাঙ্গাকারীর চেয়ে দাঙ্গা-প্রতিরোধকারীর সংখ্যা সেদিন বেশি ছিল। তাই ব্যাপার বেশিদূর গড়ায় নি।

তবে জান না গেলেও মান গিয়েছিল অনেকের। একটা উদাহরণ দিই। দাঙ্গা যে লাগতে পারে, তা আগের দিন থেকে অনুমান করা যাচ্ছিল। যেদিন দাঙ্গা লাগে, সেদিন সকালেই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের শিক্ষকদের কমনরুমে, আমার শিক্ষক ভবানীচরণ রায়কে এ সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলাম। বি সি রয় নামে সুপরিচিত এই শিক্ষকের পিতা ছিলেন বৈষ্ণব-সাহিত্যের বিশিষ্ট পণ্ডিত, *পদকল্পতরুর* সম্পাদক এবং জগন্নাথ কলেজের এককালীন অধ্যাপক সতীশচন্দ্র রায়। হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজিতে এম. এ. পরীক্ষা দিয়ে ভবানীবাবু প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন। দীর্ঘকাল রংপুরের কারমাইকেল কলেজ ও ঢাকার জগন্নাথ কলেজে অধ্যাপনার পর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। জগন্নাথ কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপল হরিপ্রসন্ন রায় এবং আরো কয়েক জনের সঙ্গে মিলে চিরকুমার ভবানীবাবু রথখোলায় একটা মেসে থাকতেন। আমার সতর্কবাণী তিনি হেসে

উড়িয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন : 'পাড়ায় আমাকে সবাই চেনে— কেউ আমার ক্ষতি করবে না। তাছাড়া আমি তো মোটেই রাজনীতি করি না।' সেদিন সন্ধ্যায়ই তিনি বিপদে পড়েছিলেন এবং সময়মতো তাঁর সহকর্মীরা উপস্থিত হয়ে তাঁর এবং মেসের অপর বাসিন্দাদের প্রাণ রক্ষা করেছিলেন। যাহোক, দাঙ্গার কারণে পরদিনই বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। খোলার পরে ভবানীবাবুকে দেখে প্রথমটায় আমি চিনতে পারিনি। বারো-তেরো বছর ধরে যাঁকে কেবল শাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরতে দেখেছি হঠাৎ করে রঙিন শার্ট-ট্রাউজারে তাঁকে চেনা দায়। কিছু ভাবনা-চিন্তার আগেই আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল : 'এ কী স্যার, এই পোশাক!' বেদনা আর গ্লানিতে ভবানীবাবুর মুখ ছেয়ে গেল, কান্নার চেয়ে করুণ হাসি হেসে একটু যেন বিকৃত কণ্ঠে বললেন : 'ফর দি সেক অফ ডিয়ার লাইফ, মাই ফ্রেন্ড।' আমি মর্মে মরে গেলাম, তাঁর মুখে যেন নিজের গ্লানির প্রতিফলন দেখলাম। ভবানীবাবুকে আর ধুতি-পাঞ্জাবি পরতে দেখিনি। পরে, কোনো এক ছুটিতে, কলকাতায় গিয়ে সেখানেই মারা গিয়েছিলেন তিনি— মৃত্যুর সময়ে জন্মভূমির কোল পাননি।

এসব সত্ত্বেও ১৯৬৪ সালের দাঙ্গা-প্রতিরোধ মনে যে-বিশ্বাস জাগিয়েছিল, ১৯৭১ পর্যন্ত তা অটুট ছিল। এ সময়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদী ভাবধারা ক্রমেই বিস্তার লাভ করছিল, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি শক্তিশালী হচ্ছিল, বরঞ্চ কখনো কখনো— যেমন ১৯৭১ সালে— বাঙালি-অবাঙালি সংঘাতের আশঙ্কা দেখা যাচ্ছিল। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে বহু জায়গায় হিন্দুর বিষয়সম্পত্তি লুঠ ও অধিকার করা হয়েছিল, তবে তার পেছনে ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কিংবা তার দোসরদের প্রত্যক্ষ উস্‌কানি। একে তারা মুসলমানদের রেয়াত করেনি, তার উপর তাদের বিশেষ ক্রোধ ছিল হিন্দুর ওপরে। এ দেশের হিন্দুরা অধিক সংখ্যায় ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিলে সেখানে যদি একটা সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তাতেও পাকিস্তানিদের লাভের সম্ভাবনা ছিল। তাই ১৯৭১-এ যা ঘটেছিল, তাকে সাম্প্রদায়িক ব্যাপার বলা চলতো না।

স্বাধীন বাংলাদেশে সাম্পদায়িক সম্প্রীতির যে আন্তরিক অভিব্যক্তি প্রত্যাশিত ছিল, এখন পেছন ফিরে মনে হচ্ছে, ১৯৭২-৭৩ সালেই তার অভাব দেখা দিয়েছিল। ১৯৭১ -এ যাঁরা হিন্দুর সম্পত্তি দখল করেছিলেন, ১৯৭২-এ তা ফেরত দিতে তাঁদের অনেকেরই অনিচ্ছা ছিল। কেউ কেউ শেষ পর্যন্ত ফেরত দেননি এবং এসব বিষয়ে সরকারের কাছে নালিশ করেও প্রতিকার পাওয়া যায়নি। তার থেকেই বোঝা যায় যে, বিষের ক্রিয়া নতুন করে দেখা দিয়েছিল। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক বিধ্বস্ত রমনা কালীবাড়ি পুনর্নির্মাণের দাবি কোনো সরকারই পূরণযোগ্য বিবেচনা করেনি। বেতার-টেলিভিশনে অন্য ধর্মগ্রন্থ পাঠও অনেকের মনোপূত হয়নি। ১৯৭২-৭৩-এর পুজোর সময়ে কোথাও কোথাও এমন কিছু ঘটনা ঘটেছিল যে, তুলনায় পাকিস্তান আমল অনেক নিরাপদ ও সহনশীল ছিল বলে অনেকে মনে করেছিলেন। বাংলাদেশের সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার উচ্ছেদ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রধর্মের প্রবর্তন পর্যন্ত সময়টায় নানাভাবে মুসলমান-অমুসলমানের ভেদ প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ধর্ম নিয়ে

রাজনীতি করার সুযোগ ফিরে আসায় এবং মুক্তিযুদ্ধবিরোধীরা ক্ষমতাসীন হওয়ার সুযোগ ফিরে পাওয়ায় ধর্মীয় জিগির তুলে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে আক্রমণ ও স্থানচ্যুত করার প্রয়াস যেমন দেখা যায় তেমনি ধর্মীয় বিভেদের কথাটাও খুব সামনে টেনে আনা হয়। রাষ্ট্রধর্ম-প্রবর্তনের পরে আমরা 'স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটি' গঠন করেছিলাম। পাশাপাশি গড়ে ওঠে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে অমুসলমানদের মানসিকতায়ও যে পরিবর্তন ঘটছিল, তা এ থেকে বোঝা যায়। এও বোঝা যায় যে, পাকিস্তান আমলের ধর্মীয় সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘু ব্যাপারটা আবার ফিরে এলো। ১৯৯০ সালে বাবরি মসজিদকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ঘটলো। আমরা সবাই বললাম, স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনকে দুর্বল করার চক্রান্ত এটা। কিন্তু যাঁরা ভুক্তভোগী, এ কথায় তাঁদের সান্ত্বনা পাওয়ার কোনো সংগত কারণ ছিল না।

১৯৯০ সালেও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা প্রতিরোধ করতে অগ্রসর হয়েছিলেন, কিন্তু ১৯৬৪ সালের তুলনায় তার প্রাণশক্তি যেন ক্ষীণ ছিল। যে-সংগঠিত ভূমিকা ১৯৬৪ সালে দেখা গিয়েছিল— সংবাদপত্রের, রাজনৈতিক নেতাদের, সাংস্কৃতিক সংগঠনের— সেই সংগঠিত রূপে এবারে শৈথিল্য ছিল এবং তাই সবকিছু করা সত্ত্বেও সময়মতো অনেক কিছু করা হয়নি। ১৯৯০ সালের হাঙ্গামাসৃষ্টির মূলে একটি দৈনিকের মিথ্যে সংবাদ-পরিবেশন অনেকখানি দায়ী ছিল। শেষ পর্যন্ত সেই পত্রিকার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। অথচ সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার ক্ষয়ক্ষতি এবং দাঙ্গাবিরোধী প্রতিরোধের বিবরণ-সংবলিত চট্টগ্রামের একটি প্রকাশনা— ডঃ দিলীপ দে-সম্পাদিত *গ্লানি*— বর্তমান সরকার নিষিদ্ধ করে দিলেন। তার পেছনে অবশ্য আরেক দৈনিকের প্ররোচনা ছিল, কিন্তু *গ্লানির* প্রতিক্রিয়া কোনোভাবে প্রথমোক্ত দৈনিকের মিথ্যে সংবাদের প্রতিক্রিয়ার তুল্য হতে পারতো? এর ফলে যদি কারো মনে হয় যে, মার খেয়ে মার হজম করা ছাড়া গত্যন্তর নেই— তাহলে কি ভুল হবে?

এই অসহায়ত্বের বোধ, অনিশ্চয়তাবোধ ও নিরাপত্তার অভাববোধ গত দুবছরে অমুসলমানদের মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে, হিন্দুর নীরব দেশত্যাগও তেমনি বেড়েছে। আমরা তার প্রতিকার করতে পারিনি, শুধু সরকারি স্ট্যাটিসটিকাল ইয়ারবুকে দেশের জনসংখ্যার ধর্মীয় বিভাজন দেখানো বন্ধ রেখে অমুসলমানের সংখ্যাহ্রাসের বিষয়টা ধামাচাপা দিয়েছি। ১৯৯২-এর শেষে আবার সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা দেখা দিল বিস্তৃততর এলাকা জুড়ে। এবারেও আমরা সময়োচিত, সংগঠিত ও কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারিনি। ওই অনিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাহীনতার বোধ এখন আরো গভীর হবে— কেননা এবারেও সময়মতো প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়নি— এবং আমরা হয়তো তার কিছুই করতে পারবো না।

নিজেদের ব্যর্থতাই আমাকে পীড়ন করে বেশি। কোনো ধর্ম বলে না যে, অন্য ধর্মাবলম্বীকে আঘাত করো। যাঁরা সত্যি ধর্মপ্রাণ, তাঁরা এ কথাটা অন্যদের বোঝাতে ব্যর্থ হয়েছেন। আমরা যারা ধর্ম নিয়ে কথা বলি না, মানবতা শুভাশুভ ন্যায়-অন্যায়

নিয়ে কথা বলি, তারা কি সমাজে কোনো প্রভাবই বিস্তার করতে পারলাম না? আজ যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যেও সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প দেখি, তখন মনে হয়, আমার জীবনসাধনা ব্যর্থ, তেত্রিশ বছর শিক্ষকতা করেও আমি কিছু শেখাতে পারিনি। রাষ্ট্রধর্ম প্রবর্তিত হওয়ার পর কেউ কেউ অমুসলমানদের মন্ত্রণা দিচ্ছেন স্বতন্ত্র নির্বাচন দাবি করতে, অর্থাৎ দ্বিজাতিতত্ত্ব ফিরিয়ে আনতে। বাংলাদেশের জন্যে এর চেয়ে বড় পরাজয় আর কিছু হতে পারে না। গত চল্লিশ বছর আমরা এরই বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি। যতো দুর্যোগ আসুক, মুক্তিযুদ্ধবিরোধী প্রতিক্রিয়াশীলদের কাছে আত্মসমর্পণ করে আমরা যেন ধর্মসম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ভিন্নতা প্রতিষ্ঠিত না করে বসি। বরঞ্চ গত বিশ বছরে যা করতে পারিনি, এখন নতুন উদ্যম নিয়ে তা করতে হবে। ধর্ম যে ব্যক্তিগত ব্যাপার, রাষ্ট্রীয় কাজের সঙ্গে তার সম্পর্ক নেই, এ কথা বোঝাতে হবে। ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সহনশীলতা ছাড়া যে গণতন্ত্র অচল, তা বোঝাতে হবে। অন্য দেশে অন্যায় কিছু ঘটলে মানুষ হিসেবে আমরা তার প্রতিবাদ করবো, কিন্তু নিজের দেশে অনুরূপ অন্যায় দিয়ে তার যে প্রতিবাদ হয় না, এ কথা বোঝাতে হবে। আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে, সামাজিকতায়, রাজনীতিতে— যেখানেই সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির প্রকাশ দেখা যাবে, সেখানেই তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হবে। ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির যোগ ঘটানোর ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে আমাদের রাষ্ট্র-পরিচালকদের অবহিত হতে হবে। তাঁরা কি দেখছেন না যে, ধর্মব্যবসায়ীরা দেশের মানুষকে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান বলে ভাগ করে ক্ষান্ত হচ্ছে না— কাদিয়ানী-শিয়াদের অমুসলমান বলে ঘোষণার দাবিতে নতুন করে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে? কে মুসলমান আছে, কার মুসলমানত্ব খারিজ হয়ে গেছে, তা নির্ণয়ের দায়িত্ব আত্মসাৎ করেছে একটি রাজনৈতিক দল। বহুদিন ধরে তারা বাংলাদেশে আহমদিয়াদের ওপর অত্যাচার করে আসছে— ঢাকার সাম্প্রতিক ঘটনায় শুধু সেদিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। পাকিস্তানে কাদিয়ানিদের অমুসলমান ঘোষণা করা হয়েছে, এরা চায় বাংলাদেশে তা করা হোক। পাকিস্তানে শিয়াদের অমুসলমান ঘোষণার দাবি করা হয়েছে, এরা বাংলাদেশে সে দাবি তুলেছে। কদিন পর ইসমাইলি বা লা-মজহাবিদের সম্পর্কে এ কথা বলবে। কে মুরতাদ, কে কাফের, তা আজ যারা স্থির করে দিচ্ছে, কাল কোথায় গিয়ে তারা থামবে, কে জানে! এদের স্বেচ্ছাচারের পরিণাম কী হতে পারে, তা আমাদের কল্পনাতীত। সাম্প্রদায়িকতাকে প্রবলভাবে রুখে দাঁড়াতে না পারলে বাংলাদেশ আর বাংলাদেশ থাকবে না— হয়তো এখনই নেই।

ধর্মনিরপেক্ষতা

ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটি বাংলা ভাষায় নবীন আগন্তুক। এতই নতুন যে, তা কোনো বাংলা অভিধানে এখনো প্রবেশাধিকার পায়নি। শব্দটি ইংরেজি সেকুলারিজমের অনুবাদ। সেকুলারিজম শব্দটি ইংরেজি ভাষায় চালু হয়েছে উনিশ শতকের মধ্যভাগে। ওর মূলে আছে সেকুলার কথাটা। প্রাচীন ফরাসি থেকে শব্দটা মধ্যযুগের ইংরেজিতে গৃহীত হয়েছিল অন্তত পনেরো শতকে। যে ল্যাটিন শব্দটি থেকে এর উৎপত্তি, মূলে তার অর্থ ছিল প্রজন্ম বা যুগ। তার থেকে খ্রিষ্টীয় ধর্মবিষয়ক রচনায় শব্দটি ব্যবহৃত হয় ধর্ম ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কহীন কিছু অর্থাৎ ইহলোক ও তৎসংক্রান্ত ব্যাপার বোঝাতে। যে- বাড়িঘর উপাসনার জন্য নির্মিত নয়, তা সেকুলার; যে-শিক্ষাব্যবস্থা ধর্মের পাঠ দেয় না, তা সেকুলার; যে-ভাবধারা পার্থিব বিষয়ে সীমাবদ্ধ, তা সেকুলার। অতএব সেকুলারিজম বলতে বোঝায় ইহজাগতিকতা। অনেকদিন আগে আমি ইহজাগতিকতার ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছিলাম এভাবে ঃ

> যে-জগৎ ইন্দ্রিয়গোচর ও যুক্তিগ্রাহ্য এবং যে-জীবন জন্ম ও মৃত্যুর সীমায় আবদ্ধ, সেই জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সম্পূর্ণ উৎকণ্ঠাকেই বলা যায় ইহজাগতিকতা। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে এ এক সম্পূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে পরলোক ও পরকাল সম্পর্কে কিংবা অতিপ্রাকৃত ও আত্মা সম্পর্কে চিন্তাভাবনা প্রশ্রয় পায় না। পৃথিবী ক্ষুদ্র হোক আর বিপুল হোক, জীবন পদ্মপত্রে নীর হোক আর জীবকোষের সমাহার হোক, এই পৃথিবীতে সুখ-দুঃখ-বিরহ-মিলন-পরিপূর্ণ মানবজীবনের সাধনাই ইহজাগতিকতার মূল কথা।

ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটিকে যাঁরা সেকুলারিজমের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে প্রয়োগ করেছিলেন, তাঁরা ভুল করেননি। নিরপেক্ষ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অপেক্ষারহিত; ওতে কর্মসম্বন্ধহীন, প্রয়োজনরহিত বা উদাসীন বোঝায়। আমরা যখন জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্র বা দলনিরপেক্ষ ব্যক্তির কথা বলি, তখন নিরপেক্ষ শব্দের সেই দ্যোতনাই ধরা পড়ে। কোনো জোটের সঙ্গে যে-দেশের যোগ নেই, সেই দেশ জোটনিরপেক্ষ; কোনো দলের সঙ্গে যে-মানুষের সংস্রব নেই, তিনিই দলনিরপেক্ষ। সুতরাং ধর্মের সঙ্গে যে-বিষয়ের সম্পর্ক নেই তা ধর্মনিরপেক্ষ, ধর্মের সঙ্গে যে-রাষ্ট্রের সংস্রব নেই, তা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। তবে নিরপেক্ষতা শব্দের ব্যাপকতর প্রচলিত অর্থ পক্ষপাতহীনতা। তাই অনেকে মনে করেন, নাগরিকদের মধ্যে প্রচলিত একাধিক ধর্মের মধ্যে রাষ্ট্র যদি পক্ষপাত না করে, তাহলেই বোধহয় সে রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হলো; যেমন, টেলিভিশনে একই সঙ্গে কুরআন, গীতা, ত্রিপিটক ও বাইবেল পাঠ করলে বোঝা গেল রাষ্ট্র কোনোটির প্রতি পক্ষপাতিত্ব করছে না। আসলে রাষ্ট্রের পক্ষে কোনো ধর্মের বা ধর্মীয় বিষয়ের সংস্রবহীনতাই হলো ধর্মনিরপেক্ষতা। আমাদের বহু নেতা ও মনীষী বহুবার বলেছেন যে, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়। এ কথা ভারতীয় নেতা ও মনীষীর অনেকের মুখেও শোনা গেছে। কিন্তু এতে ঠিকমতো বোঝা যায় না যে, রাষ্ট্র ধর্মীয়

ব্যাপারে জড়িত হবে না, ধর্ম থাকবে মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও আচরণের বিষয় হয়ে— এই হলো রাষ্ট্রীয় ধর্মনিরপেক্ষতার মূল কথা।

ধর্মনিরপেক্ষতার যে ভাবাদর্শ, তার বিকাশের একটা দীর্ঘ ইতিহাস আছে। প্রাচীন গ্রিসে এর সাক্ষাৎ পাই— যেমন এপিকিউরিয়ান দর্শনে; প্রাচীন ভারতবর্ষে এর পরিচয় পাই— যেমন চার্বাক মত বা লোকায়ত দর্শনে ; আরব ভূখণ্ডে এর অস্তিত্ব দেখি— ইবনে রুশ্‌দ বা মুতাজিলাদের মুক্তচিন্তায়। কিন্তু এসব ভাবধারা সমাজে প্রাধান্যবিস্তার করতে সমর্থ হয়নি, পরিবেশের ওপর জয়ী হয়নি। সেই জয় ঘটে ইউরোপে রেনেসাঁসের সময়ে, মানববাদের বিকাশের কালে।

ইউরোপে মানববাদের বিকাশ হয় খ্রিষ্টীয় নীতিবোধের সহস্রবর্ষব্যাপী প্রাধান্যের পটভূমিকায়। খ্রিষ্টীয় মূল্যবোধে ইহজীবনকে গণ্য করা হয়েছিল পারলৌকিক জীবনের প্রস্তুতিপর্ব বলে। তাই পৃথিবীতে সুখী জীবনযাপনের স্পষ্ট প্রয়াস নয়— ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশের যোগ্যতালাভের সাধনাই মানুষের প্রকৃত জীবনধারা বলে বিবেচিত হয়েছিল। দারিদ্র্যবরণ, সংযমসাধন ও আদেশপালন ছিল এই নীতিবোধের মূলকথা— দেহ সম্পর্কে কুণ্ঠাবোধ এবং জাগতিক ভাবনায় লিপ্ত থাকার বিরোধিতা ছিল এর অপরিহার্য অঙ্গ। পরলোকের প্রতি ত্রাসযুক্ত দৃষ্টিকে মানববাদীরা ইহলোকের প্রতি অনুরাগের দৃষ্টিতে রূপান্তরিত করতে চাইলেন। তাঁরা জোর দিলেন ইহলোকের ওপর, দেহকে বললেন সুন্দর, সুখসন্ধানকে মনে করলেন সংগত। তাঁরা যাজক সম্প্রদায়ের কর্তৃত্ব অস্বীকার করলেন এবং উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে, নৈতিকতা ধর্মভিত্তিক নয়।

সমাজশক্তির যে-রূপান্তরের ফলে মানববাদের বিকাশ ঘটে, তা একদিকে সামন্তবাদ ও যাজকগোষ্ঠীর শাসন থেকে ব্যক্তির মুক্তি ঘটাতে সাহায্য করে, অন্যদিকে ধর্মসাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে স্বাদেশিকতার জাগরণ ও রাজার ঐশ্বরিক অধিকারের ধারণার বিপক্ষে জনমতগঠনকে সম্ভবপর করে তোলে। স্বাধীন ও সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের পর ক্রমে ধর্ম ও রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ ঘটল এবং এই মত স্বীকৃত হলো যে, রাষ্ট্রের দায়িত্ব তার সকল নাগরিকের ইহলৌকিক কল্যাণসাধনের নিরলস প্রচেষ্ট করা।

ইউরোপের সব দেশেই যে সকল অর্থে রাষ্ট্র ও ধর্মের পৃথকীকরণ ঘটেছে, তা বলা যাবে না। যুক্তরাজ্যের রাজা বা রানী চার্চ অফ ইংল্যান্ডের রক্ষাকর্তা। এই অর্থে অ্যাংলিকান চার্চ যুক্তরাজ্যের সরকারি ধর্ম। অন্যদিকে ক্যাথলিক ধর্মের অসাধারণ প্রভাব সত্ত্বেও ফরাসী দেশ ধর্মনিপেক্ষ রাষ্ট্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রোটেস্টান্টদের প্রাধান্য সত্ত্বেও তা ধর্মনিরপেক্ষ দেশ — সরকারি কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ে কোনো প্রার্থীকে কিছু জিজ্ঞাসা করা সে-দেশের সংবিধান-বিরোধী। কর্মক্ষেত্রে ঈশ্বরের নামে শপথ নেয়া কিংবা শিক্ষালয়ে বাধ্যতামূলকভাবে বাইবেল পাঠ বা প্রার্থনা করাও সংবিধান-বিরোধী বলে সে-দেশের সর্বোচ্চ আদালত স্থির করেছেন। কামাল আতাতুর্ক তুরস্ককে ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্রে পরিণত করেন এবং সম্পত্তির উত্তরাধিকার ও নারীর স্বাধীনতা-বিষয়ে ধর্মনিরপেক্ষ আইন প্রবর্তন করেন। শেষোক্ত বিষয়টি খুব মনে রাখার যোগ্য। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে স্বভাবতই ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকে। কিন্তু সে-স্বাধীনতার কি কোনো সীমা নির্ধারণ করা প্রয়োজন হয় বা তেমন কিছু করা সংগত হয়? ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাজ্যে বহুবিবাহ একটি দণ্ডনীয় অপরাধ। কোনো ধর্ম

বা সম্প্রদায়ের বিধানে তা স্বীকৃত থাকলেও সেই ধর্ম বা সম্প্রদায়ের অনুসারী সে-দেশে বহুবিবাহ করতে পারবে না, কেননা, তা সাংবিধানিক নৈতিকতার বিরোধী। তুরস্কেও মুসলিম পারিবরিক আইন বহুক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু ভারতে হিন্দু ও মুসলমানের উত্তরাধিকার-আইন আলাদা, মুসলমান সেখানে বহুবিবাহ করতে পারে, হিন্দু পারে না। বাংলাদেশে মুসলমানের বিবাহবিচ্ছেদ হয়, ধর্মান্তরিত নাহলে হিন্দুর বিবাহবিচ্ছেদ হয় না। এসব ক্ষেত্রে সকল ধর্মের নাগরিকের জন্যে একই আইন প্রচলন করা ভারতের কিংবা বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভবপর হয়নি। অথচ ভারতে ও বাংলাদেশে হিন্দু বা মুসলমানদের জন্যে একই ফৌজদারি আইন প্রচলিত।

ফৌজদারি আইনের এই ঐক্য অবশ্য ইংরেজ শাসকদের দান। তাঁরা প্রচলিত মুসলিম ফৌজদারি আইন উঠিয়ে দিয়ে ব্রিটেনের আদর্শে নতুন ফৌজদারি আইন চালু করেন— যা সকল সম্প্রদায়ের মানুষের জন্যে প্রযোজ্য। কিন্তু উত্তরাধিকার ও পারিবারিক আইনের ক্ষেত্রে যার যার ধর্মীয় আইনের বিধান কার্যকর রয়ে যায়। পাকিস্তান আমলে মুসলিম পারিবারিক আইনের যে-সংস্কার হয়েছিল, বাংলাদেশে তা প্রচলিত রয়েছে, তবে হিন্দুর ক্ষেত্রে কোনো আইনগত সংস্কার হয়নি। ভারতে হিন্দু পারিবারিক আইনের সংস্কার করা হয়েছে, কিন্তু মুসলিম উত্তরাধিকার ও পারিবারিক আইনের সংস্কার হয়নি। শুধু সংস্কার হয়নি, তা নয়। শাহবানুর চাঞ্চল্যকর মামলার রায়ের পর শিক্ষিত প্রগতিশীল মুসলিম জনমতকে উপেক্ষা করে সেখানে পুরোনো ধর্মীয় বিধানকে শক্তিশালী করা হয়েছে।

যুগোপযোগী সংস্কার করলে মানুষ যে তা মেনে নেয়, তার প্রমাণ ব্রিটিশ ভারতের ফৌজদারি আইন এবং পাকিস্তানের পারিবারিক আইন। আজ অনেকেই মনে করেন যে, মুসলিম উত্তরাধিকার-আইনের সংস্কার হওয়া দরকার। অনেকে মনে করেন, বাংলাদেশে কিছু পারিবারিক আইনেরও সংস্কার হওয়া উচিত। প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে নাগরিকের কল্যাণকামী একই আইন সকলের জন্যে প্রযোজ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। কামাল আতাতুর্ক তুরস্কে তাই করেছিলেন।

হয়তো আমাদের দেশে এখনো সে সময় উপস্থিত হয়নি। বাংলাদেশে গত বারো বছর ধরে আমরা ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছি— সাংবিধানিক সংশোধন এবং সরকার অনুসৃত নীতির মাধ্যমে। কেউ কেউ বলেন, মানুষ ধর্মনিরপেক্ষ না হলে রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ হবে না। এ কথা গ্রাহ্য নয়। যিনি ধার্মিক, তিনি অসাম্প্রদায়িক হতে পারেন, কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভবপর নয় — অন্তত বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। কেননা বেশির ভাগ ধর্মেই জোর দেওয়া হয়েছে পরলোকের ওপরে — সেখানেই অনন্ত জীবনলাভের সম্ভাবনা। খুব কম ধার্মিক মানুষই পরলোকের ভাবনা ত্যাগ করে ইহলোকমুখী হবেন।

কিন্তু ব্যক্তি যা পারে না, রাষ্ট্র তা পারে। ধর্মের বিষয়ে মাথা না গলিয়েও রাষ্ট্র চলতে পারে। ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র সেভাবেই চলে। সেখানে ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার— রাষ্ট্রীয় বিষয় নয়। ব্যক্তির ধর্মপালনের স্বাধীনতা সেখানে থাকে— আদর্শ ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে আর দশটা স্বাধীনতার মতো ধর্মীয় স্বাধীনতাও শর্তাধীন হয়ে থাকে। সেখানে রাষ্ট্রের লক্ষ্য হয় নাগরিকের ইহজীবনকে সুখী ও সার্থক করে তুলতে সাহায্য করা।

দেশ, ভাষা, জাতি

কথায় কথায় আমরা বলে থাকি, হাজার বছরের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য। এ থেকে ধরে নেওয়া যায় যে, বাংলা ভাষার সূচনা হয়েছে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে। বাংলা ভাষার আদি নমুনা পরীক্ষা করে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সুকুমার সেন মোটের উপর এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। আবার একই নমুনার ভিত্তিতে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাংলা ভাষার উৎপত্তি বিবেচনা করেন সপ্তম শতাব্দীতে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন যে, নানা নৃগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে এই সপ্তম শতাব্দীতেই বাঙালি জাতি গড়ে ওঠে।

কিন্তু সে-সময়ে এ জাতির বাঙালি পরিচয় ছিল বলে মনে হয় না, এ ভাষাও বাংলা নাম ধারণ করেনি এবং এ জাতিরও অখণ্ড বাসস্থান ছিল না। বাংলা ভাষার আদি নমুনা যে চর্যাগীতি, তার একটি পদে 'বঙ্গালী' শব্দটি আছে। তবে ওটা জাতিবাচক শব্দ কিনা, সে-সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে সন্দেহ আছে। কেউ কেউ মনে করেন, শব্দটি প্রয়োগ করা হয়েছে নিঃস্ব, ক্লিষ্ট বা পতিত অর্থে।

বঙ্গের অধিবাসী অর্থে 'বঙ্গালী' শব্দটি ধরে নিলেও তার একটা সীমাবদ্ধতার কথা মনে রাখতে হবে। পরবর্তীকালে বাংলাভাষীদের যে-অখণ্ড এলাকা গড়ে ওঠে, সে-সময়ে তা কতকগুলো অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। যেমন, রাঢ়, সুহ্ম, গৌড়, বঙ্গ, পুণ্ড্র, সমতট, কামরূপ, হরিকেল। বঙ্গ অনেকগুলি এলাকার মধ্যে ছিল একটি। কোনো কোনো পণ্ডিত মনে করেন, অনেকগুলি অঞ্চলের নামের মধ্যে জাতির নাম লুকিয়ে আছে। অঞ্চলগুলির নামের ও ভৌগোলিক এলাকার কিছু হেরফের কালক্রমে ঘটেছিল— কামরূপ পরে আসামের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে উঠেছিল— তবু অঞ্চলগুলির স্বতন্ত্র পরিচয় রয়ে গিয়েছিল। আবার, অনেক সময়ে একাধিক বা একটির নাম দিয়েও সমগ্র এলাকা বোঝানো হতো। যে-অর্থে আমরা পরবর্তীকালে বঙ্গদেশ বলি, সেই অর্থে গৌড়-বঙ্গ বা শুধু গৌড় নামের ব্যবহার ছিল।

সমগ্র বাংলাভাষী অঞ্চল বলতে বাঙ্গালা নামের ব্যবহার কবে থেকে শুরু হলো, নির্দিষ্ট করে বলা মুশকিল। তবে এটা জানা যাচ্ছে যে, চোদ্দ শতকে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্ 'শাহ্-ই-বাঙ্গালা' বা 'শাহ্-ই-বাঙ্গালিয়ান' উপাধিতে পরিচিত হয়েছিলেন। ইতিহাসবিদ আবুল ফজল ষোল শতকে সুবা বাঙ্গালার কথা বলেছেন। এই বাঙ্গালা থেকেই আরবি-ফারসিতে বাঙ্গালা-বানজালা হয়েছে, চীনায় হয়েছে মানচালা। পর্তুগিজরা বেঙ্গলা করেছিল, তার থেকে ইংরেজিতে বেঙ্গল। বাংলায় বাঙ্গালা, বাঙলা, বাংলা; আবার মূল বঙ্গ ধরে বঙ্গদেশ। সতেরো শতকের কবি আবদুল হাকিম দেশের নাম বঙ্গ এবং ভাষার নাম বঙ্গবাণী বলেছেন, তা আমরা সকলেই জানি।

উদ্ভবকালে ভাষার নাম বাংলা ছিল না, একথা বলেছি। সাধারণত বলা হতো 'ভাষা'। 'ভাষা' বলতে বোঝাতো সাধারণ লোকের ভাষা, তাতে মূলত সংস্কৃত থেকে মৌখিক ভাষার পার্থক্য নির্দেশ করা হতো। সাধারণ লোকের ভাষা— এই অর্থে

'প্রাকৃত' শব্দটিও চালু ছিল— যদিও প্রাকৃত বলতে আমাদের ভাষার বিবর্তনের একটি স্তর বোঝা যায় এবং আঠারো রকম প্রাকৃত ভাষার কথা জানা যায়। ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলা ভাষা বোঝাতে গৌড় ভাষাও বলা হতো। গৌড় ছিল পশ্চিম ও মধ্য বাংলা, সে এলাকার ভাষা হিসেবে গৌড় ভাষা কথাটা চলে আসে। *প্রবোধচন্দ্রিকায়* মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার 'গৌড়ীয় ভাষা' নামে বাংলাভাষাকেই অভিহিত করেছিলেন। রামমোহন রায় বাংলা ভাষার যে-ব্যাকরণ লেখেন, তার নাম দিয়েছিলেন *গৌড়ীয় ব্যাকরণ*। আবার *মেঘনাদবধ কাব্যে* মধুসূদন 'গৌড়জন' বলতে সকল বাংলাভাষীকেই বুঝিয়েছিলেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন যে, গৌড় ভাষার পাশাপাশি বঙ্গভাষা কথাটাও ব্যবহৃত হতো। কবে থেকে হতো, সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নেই। বঙ্গ বলতে বোঝাতো ভাগীরথী ও পদ্মা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল— সেই অঞ্চলের ভাষা বঙ্গভাষা। মধুসূদন তো 'বঙ্গভাষা' নামে সনেট লিখেছিলেন।

বিজয়ী মুসলমানদের কল্যাণে দেশ যখন বাঙ্গালা নামে অভিহিত হলো, তখন ফারসি ভাষায় দেশের ভাষার নাম দাঁড়িয়ে গেল জবান-ই-বাঙ্গালা। পর্তুগিজেরা মনে হয় এরই হুবহু অনুবাদ করে নিয়েছিলেন। আঠারো শতকে পর্তুগিজ পাদরি মানোএল দা আসসুমসাঁও যে বাংলা-পর্তুগিজ শব্দকোষ প্রকাশ করেছিলেন, তার নাম ছিল *বোকাবুলারিও এম ইডিয়মা বেঙ্গালা এ পর্তুগিজ*। ওই শতকের শেষে নাথানিএল ব্রাসি হ্যালহেড ইংরেজি ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ লেখেন, তার নাম দেন *এ গ্রামার অফ দা বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ*। লক্ষ্য করবেন, বেঙ্গলি নয়, বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ। উনিশ শতকের গোড়ায় শ্রীরামপুর মিশনারিরা যখন বাংলায় বইপত্র ছাপাতে শুরু করেন, তখন তাঁরা 'বাঙ্গালি ভাষা' কথাটা ব্যবহার করেন। মনে হয়, বাঙালিদের ভাষা অর্থেও কথাটা ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে। ইংরেজিতে তাঁরা বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজ বলছিলেন। বেঙ্গলি বানান লেখা হচ্ছিল কখনো এল-এর পরে আই দিয়ে, কখন দুটি ই দিয়ে। বাংলা ভাষা বোঝাতে বাঙ্গালা ও বাঙ্গলা ব্যবহৃত হচ্ছিল— সতেরো-আঠারো শতকে তার অনেক পরিচয় পাই।

জাতিবাচক অর্থে বাঙালি শব্দের প্রথম ব্যবহারের কথা জানতে পারি পঞ্চদশ শতাব্দীতে। ওই শতাব্দীর গোড়ার দিকে শাহাবুদ্দীন বায়জিদ শাহকে হত্যা করে তাঁর পুত্র আলাউদ্দীন ফিরোজ শাহকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজা গণেশ রাজ্য চালাতে থাকেন। *গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ* বইতে মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান লিখেছেন যে, গণেশ কয়েকজন দরবেশকে হত্যা করেছিলেন। সে-সময়ে দরবেশদের নেতা শেখ নূর কুতুব আলম গণেশের দৌরাত্ম্য দূর করার জন্যে জৌনপুরের সুলতান ইবরাহিম শার্কিকে অনুরোধ করেন। এই নূর কুতুবে আলম পরিচিত ছিলেন শেখ নূর বাঙালি বলে। ইবরাহিম শার্কি গৌড় আক্রমণ করলে শেখ নূর বাঙালির কাছে গণেশ ক্ষমাপ্রার্থনা করেন এবং পুত্র যদুকে ইসলাম গ্রহণ করতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। জালালুদ্দীন মুহম্মদ শাহ নাম নিয়ে যদু সিংহাসনে আরোহণ করেন। তখন ইবরাহিম শার্কিকে শেখ নূর জৌনপুরে ফিরে যেতে বলেন। অসন্তুষ্টচিত্তে ইবরাহিম দরবেশের আদেশ পালন

করেন বটে, তবে পুত্রকে সরিয়ে দনুজমর্দন দেব নাম ধারণ করে গণেশ নিজেই ক্ষমতা দখল করেন। এত কথা বলার একমাত্র উদ্দেশ্য আরেকটা কথা বলা। গণেশ সিংহাসন অধিকার করে বাংলা অক্ষরে নিজের নামে মুদ্রা প্রবর্তন করেন। মুদ্রায় বাংলার ব্যবহার হয়েছিল সেই প্রথম।

বাঙ্গালি শব্দটা সেকালের অন্য রচনায়ও পাই। যেমন সৈয়দ সুলতানের *নবীবংশ*, কারো কারো মতে এটি ষোল শতকের শেষের দিকে লেখা। কবি বলছেন, 'কর্ম্মদোষে বঙ্গেত বাঙ্গালি উৎপণ"। বাংলার অধিবাসী ও বাংলাভাষী অর্থে বাঙালি শব্দটির ব্যবহার অনেকদিনের বলে মানতে হবে।

ঊনিশ শতকে হিন্দু ও মুসলমানের স্বতন্ত্র পুনর্জাগরণ যখন ঘটতে থাকে, তখন বাঙালি বলতে শুধু হিন্দু ভদ্রসমাজকে বোঝানোর একটা প্রবণতা দেখা যায়। মুসলমানদের মধ্যেও আরব-ইরানের উত্তরাধিকার দাবি করা এবং ভারতীয় ও বাঙালি বলে নিজেদের পরিচয় না দেওয়ার প্রয়াস দেখা দেয়। শরৎচন্দ্রের *শ্রীকান্ত* উপন্যাসের (প্রথম পর্ব) একেবারে গোড়ায় বাঙালি ও মুসলমানদের ফুটবল ম্যাচের কথা আছে। সেটা এই পটভূমিকায়ই কেবল বোঝা যেতে পারে। অবশ্য এই অবস্থার বিরুদ্ধে মুসলমান সমাজেই প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল। আবার পাকিস্তান আমলে আগের মনোভাব ফিরিয়ে আনার চেষ্টা দেখা দেয়। ১৯৫৮ সালে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মৌলভী আবদুর রহমান ঘোষণা করেছিলেন ঃ 'এখন আমি আর বাঙালি নই। আমি পূর্ব পাকিস্তানী।'

এই মনোভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করেই একদিন আমরা নিজেদের সাংস্কৃতিক ও জাতিসত্তাগত পরিচয়কে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছিলাম। মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান তাঁর উপরিউক্ত বইতে লিখেছেন ঃ

> ইতিহাসের নানান যোগ-বিয়োগ শেষে বাঙালি জাতির ভবিষ্যৎ আজ বাংলাদেশের নাগরিকের ওপর বর্তেছে। মুক্তি আন্দোলনের সময় 'জাগো জাগো বাঙালি জাগো' বলে যে শ্লোগান দেওয়া হয় তা বাঙালির ইতিহাসে পূর্বে কোনোদিন ধ্বনিত হয়নি। বাংলাদেশের এই চেতনা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের চেতনা থেকে স্বতন্ত্র, ১৯৪৬-৪৭ -এর মৃতবৎস অখণ্ড সার্বভৌম বঙ্গের চেতনা হতেও স্বতন্ত্র। এর জন্মের সূত্রপাত হয়েছে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, যার মধ্যে অবশ্য পুরোনো দিনের নানা রেশ ওতপ্রোতভাবে মিশে রয়েছে।

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের যে সত্তাকে নতুন করে জাগ্রত করেছিল, মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে তাই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলা ও ইংরেজি

ইদানীং একটা কথা প্রায়ই শোনা যায় ঃ বাংলা-বাংলা করে মেতে উঠে আমরা ইংরেজিকে অবজ্ঞা করছি, ফলে আমাদের শিক্ষার মান নেমে যাচ্ছে। চাকরির ইন্টারভিউর সময়ে মাস্টার্স ডিগ্রিধারী প্রার্থীর বেশির ভাগ একটা সহজ ইংরেজি বাক্য লিখতে পারে না। সুতরাং বাংলার ওপরে এতটা জোর দেওয়া খুব ভুল হচ্ছে।

যাঁরা এসব অভিযোগ করেন, তাঁরা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে এসব কথা বলেন। সুতরাং অভিযোগের সত্যতা এবং উদ্‌বেগের যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহ নেই। কিন্তু কার্যকারণের যে-যোগ তাঁরা ঘটান, সেটি ঠিক নয়। শিক্ষার মান নেমে যাচ্ছে, এ অভিযোগ সত্য; কিন্তু সে-অভিযোগ শতাব্দীকাল প্রাচীন। ইংরেজি শিক্ষার মানের অবনতি হয়েছে, এ কথাও সত্য; তবে তাও অনেকদিন ধরে বলা হচ্ছে। কিন্তু শিক্ষার মান নেমে যাওয়া এবং ইংরেজির মানের অবনতির জন্যে বাংলা শিক্ষাকে দায়ী করা ঠিক নয়। সত্য ঘটনা হচ্ছে, বাংলা শিক্ষার মানেরও যথেষ্ট অবনতি ঘটেছে, তবে তা সহজে আমাদের বিচলিত করে না। আমাদের চোখে, বাংলার ভুল কমেডি, আর ইংরেজির ভুল ট্রাজেডি।

টি.এন. সিকুইয়েরা নামে একজন ভারতীয় শিক্ষাবিদ *Modern Indian Education Italicy* বইতে একই বিষয়ে ভারতীয় পরিস্থিতির আলোচনা করে বলেছেন: মাতৃভাষাকে স্কুলশিক্ষার বাহন করায় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমাদের ইংরেজি জ্ঞান যত না নেমে গেছে, তার চেয়ে বেশি নেমেছে ইংরেজি শিক্ষাদানের ভ্রান্ত পদ্ধতির জন্যে এবং তারও চেয়ে বেশি স্বাধীনতালাভের পরবর্তীকালে শিক্ষা সম্পর্কেই উৎসাহ কমে যাওয়ায়।

বাংলাদেশ সম্পর্কেও একথা বলা চলে এবং একথাও যোগ করা চলে যে, আমাদের স্কুলে ভাষা-শিক্ষাদানের পদ্ধতি এমনই ত্রুটিপূর্ণ এবং শিক্ষাদানের কাজ এমনভাবে চলছে যে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ভাষাজ্ঞান অসম্পূর্ণ রয়ে যাচ্ছে এবং বিষয়জ্ঞানও পূর্ণতা লাভ করছে না। যারা বাংলায় এম. এ. পাস করে যাচ্ছে, তাদের অনেকে যুক্তাক্ষরের গঠন বলতে পারে না, শুদ্ধ বাক্য লিখতে পারে না। মাতৃভাষা-শিক্ষার অবস্থা যদি এই হয়, তবে ইংরেজি শিক্ষার অবস্থা কী হতে পারে, তা সহজেই অনুমেয়। সেইসঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে, এ দেশে সাক্ষরের সংখ্যা মাত্র ২৪ শতাংশ। দেশের ৭৬ শতাংশ মানুষকে যেখানে আমরা মাতৃভাষার বর্ণমালার সঙ্গেই পরিচয় করিয়ে দিতে পারছি না, সেখানে বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে আসল সমস্যা কোথায়, তা বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়।

আমাদের দেশে যখন ইংরেজি শিক্ষা প্রচলিত হয়, তখন ইংরেজি ভাষাকে দেখা হয়েছিল আধুনিক শিক্ষার বাহন হিসেবে। মনে করা হয়েছিল, ইংরেজি ভাষার ভেতর দিয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিচিত্র জগতের সঙ্গে যারা পরিচিত হবে, তাদের মাধ্যমে সে জ্ঞান চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়বে সাধারণ মানুষের মধ্যে। তা হয়নি। হওয়া সম্ভবপর ছিল না।

কেননা, রবীন্দ্রনাথ যেমন বলেছিলেন, বিদ্যাবিস্তারের ক্ষেত্রে সর্বপ্রধান বাধাটা ছিল এই যে, তার বাহনটা ইংরেজি— বিদেশী ভাষা।

এতদিনে আমরা স্বীকার করেছি, বাহনটা বদলাতে হবে— মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা দেওয়া-নেওয়া করতে হবে। তবে নানা কারণে সকল স্তরে বাংলাভাষা শিক্ষার বাহন হয়ে উঠতে পারেনি। উচ্চতর শিক্ষার স্তরে বহুলাংশে ইংরেজি রয়ে গেছে শিক্ষার মাধ্যম। এই অবস্থায়, অনেকেই স্মরণ করিয়ে দেন, ইংরেজির গুরুত্ব বিন্দুমাত্র কমেনি— তাই ভালো করে ইংরেজি শিখতে হবে সবাইকে। এখন যদি সাত বছরে ইংরেজি পড়ে তা ভালোভাবে আয়ত্ত না করা যায়, তবে দশ বছর পড়ো, না পারলে বারো-চোদ্দ বছর।

আবার বলি, দেশসুদ্ধ লোক ইংরেজি শিখবে, এ কথা ইংরেজি প্রচলনের সময়ে কেউ ভাবেননি। রবীন্দ্রনাথ তো স্পষ্টই বলেছিলেন, 'ইংরেজি আমাদের শেখা চাইই... ইংরেজি কেন, ফরাসি জর্মন শিখিলে আরো ভালো। সেই সঙ্গে এ কথা বলাও বাহুল্য, অধিকাংশ বাঙালি ইংরেজি শিখিবে না। সেই লক্ষ লক্ষ বাংলাভাষীদের জন্য বিদ্যার অনশন কিম্বা অর্ধাশনই ব্যবস্থা, এ কথা কোন মুখে বলা যায়?'

প্রত্যেক ভাষাই জ্ঞানের রাজ্যে একটা জানালার মতো। তা খুলে দিতে পারলে অনেক লাভ। কিন্তু সাধারণ শিক্ষার জন্যে কী অপরিহার্য, সেটাই এখানে বিবেচ্য। ন্যূনতম শিক্ষার জন্যে আবশ্যক মাতৃভাষার জ্ঞান। দ্বিতীয় ভাষা আবশ্যক জ্ঞানচর্চার সহায়করূপে, আন্তর্জাতিক যোগাযোগের জন্যে— সে-যোগাযোগ ব্যবসায়িক বা কূটনেতিক বা অন্য কোনো ভাবের হতে পারে। এ ভাষাশিক্ষা কি সকলের জন্যে অপরিহার্য বা সম্ভবপর? আজ আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাংলাই ভালো করে শেখানো হয় না— ইংরেজি শেখাবার উপযুক্ত মানুষ কোথায় পাওয়া যাবে? উনিশ শতকের গোড়া থেকে অনেকেই সুস্পষ্ট মন্তব্য রেখে গেছেন যে, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরেজি পড়াবার অন্তরায়। এই অভাব আজ প্রকটতর। দ্বিতীয়ত, প্রাথমিক পর্যায়ের পর যারা আর পড়বে না, তাদের জন্যে এই ভাষাজ্ঞান কতটা কাজে লাগবে ? সে কি অভ্যাসের অভাবে, ব্যবহারের অভাবে, অচিরেই তা হারিয়ে ফেলবে না ?

সারাদেশের মানুষকে দ্বিভাষিক করে তুলতে পারলে হয়তো ভালো হতো। কিন্তু একটা ভাষা শেখানোর সাধ্যই আমাদের হচ্ছে না। সুতরাং দ্বিতীয় ভাষা শেখানোর ব্যাপারটা আমরা শুধু তাদের জন্যেই ভাবতে পারি যাদের জন্যে তা আবশ্যক। মাধ্যমিক শিক্ষার আগে তা আবশ্যক বলে মনে হয় না। যে-পদ্ধতিতে আমরা ভাষা শেখাই, বিশেষ করে ইংরেজি, সে-পদ্ধতির পরিবর্তন আরো বেশি করে দরকার। আমাদের দেশের ছাত্রেরা সোভিয়েত ইউনিয়নে গিয়ে, ফ্রান্সে গিয়ে, জার্মানিতে গিয়ে এক বছর ভাষা শিক্ষা করে পি-এইচ.ডি. পর্যায়ের অভিসন্দর্ভ লেখে ওই ভাষায়। বিদেশী ছাত্রেরা ব্রিটিশ কাউন্সিলে এক বছর ইংরেজি শিখে সেই একই কাজ করে। অথচ আমরা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে সাত বছর পড়েও ইংরেজি শিখতে

পারি না— প্রাথমিক শিক্ষার বছরগুলোতে ভাগ বসিয়েছি এবং এখন আবার ভাবছি, একেবারে প্রথম শ্রেণী থেকে ইংরেজি শেখাতে হবে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী একবার ঠাট্টা করে লিখেছিলেন, 'ষাটি বৎসর পূর্বে এদেশে সাব্যস্ত হইয়াছিল, ইংরেজি বিদ্যা না শিখিলে আমাদের মনুষ্যত্ব জন্মিবে না।' আমরা নতুন করে সেই সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছি।

পদ্ধতি বদলে অনেক কম সময়ে অনেক ভালো করে ইংরেজি শেখা সম্ভবপর। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রের জন্যে ইংরেজির বিশেষ অধ্যয়নের ব্যবস্থা আছে— একে বলা হয়, English for special purpose— বিজ্ঞানের কি চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কি প্রকৌশলবিদ্যার ছাত্রদের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন পাঠ্যসূচি, ভিন্ন ভিন্ন পঠন-পাঠনরীতি। আমরা এসবের সাহায্য নিতে পারি। কিন্তু শিক্ষার প্রথম পর্যায় থেকেই ত্রুটিপূর্ণ পদ্ধতিতে ইংরেজি শেখাবার চেষ্টা করে ছাত্রদের ভীত ও নিরুৎসাহ করার কোনো সার্থকতা নেই। এমন কি, ভুল শিখিয়ে, পরে তা সংশোধনের জন্যে সময় অপচয় করারও দরকার নেই।

জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার জন্যে দ্বিতীয় ভাষা শেখা প্রয়োজন হবে, তবে সবাই জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করবে না। যারা করবে, তাদের জন্যে ক্ষেত্রবিশেষে তৃতীয় একটি ভাষা শিক্ষারও প্রয়োজন হতে পারে। বিদেশী ভাষাশিক্ষার এমন সুযোগ দেশে সৃষ্টি করা দরকার। যারা উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশ করবে, ইংরেজি বই পড়ে বোঝার ক্ষমতাও তাদের অর্জন করা প্রয়োজন। কিন্তু তার জন্যে একেবারে প্রথম থেকে সকলের ইংরেজি শেখার দরকার নেই।

বাংলাভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে পদ্ধতি বদলের প্রয়োজন। আমরা এই ভাষার মধ্যে বাস করি বলে এ-যে শিক্ষণীয় ভাষা, তা সহজে মনে করি না। যখন ঠেকে যাই, তখন দোষ দিই ভাষাকে, বর্ণমালাকে। বলি, বাংলা ভাষার সংস্কার না হলে দেশের উন্নতি হবে না। নিজে যত্ন নিয়ে শিখব না, আর বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে বলব, ভাষা আমার উপযুক্ত হয়ে উঠুক, এ বড় অশালীন কথা।

বাংলাদেশের সংবিধানে বলা হয়েছে, প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। জীবনের সর্বক্ষেত্রে সে ভাষার প্রয়োগই তো হবে আমাদের স্বাভাবিক লক্ষ্য। বাংলা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ইংরেজি শেখার কোনো বিরোধ নেই। বিরোধ তখনই দেখা দেয়, যখন আমরা বাংলা ভাষাকে ইংরেজি শিক্ষার ও উন্নয়নের প্রতিবন্ধকরূপে দেখি। শুধু দেখি, তাই নয়। সেই প্রতিবন্ধক দূর করার জন্যে বাংলাভাষার স্বাভাবিক ক্ষেত্র সংকুচিত করতে চাই।

বাংলাভাষা ও বাংলাদেশ

বাংলা একাডেমী এ-বছর 'অমর একুশে বক্তৃতা' প্রবর্তন করেছেন এবং তা প্রদান করতে আহ্বান জানিয়েছেন আমাকে। এতে আমি যেমন সম্মানিত বোধ করেছি, তেমনি তাঁদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হয়েছি। তবে খুব সংকোচের সঙ্গে আমি এই বক্তৃতা দিতে দাঁড়িয়েছি। তার কারণটা গোড়ায় ব্যাখ্যা করা ভালো।

অমর একুশে ফেব্রুয়ারির নামে যে-বক্তৃতা দিতে হবে, তাতে, অন্তত তার প্রথমটিতে, আমার মনে হয়, সেই মহান দিনটির লক্ষ্যসাধনের পথে আমরা কতদূর অগ্রসর হয়েছি, সেই আলোচনা অনিবার্য। একুশে ফেব্রুয়ারিতে তেমন আলোচনা করা একটা প্রথাও হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু একুশেই নয়, পুরো ফেব্রুয়ারিতেই। কিন্তু বাকি এগারো মাস এই আলোচনার কোনো কার্যকারতা থাকে না। ফেব্রুয়ারি মাসের বক্তব্য অনেকে নীরবে সহ্যও করেন এই কারণে। বাকি এগারো মাস তো তাঁদের হাতের মুঠোয় বন্দি।

এই অবস্থায় বাংলাভাষা সম্পর্কে পুরোনো কথার পুনরাবৃত্তি করতে ইচ্ছে করে না। অথচ চারপাশে তাকিয়ে তারই প্রয়োজন অনুভব করি। মাত্র একমাস আগে দায়িত্বশীল এক সরকারি কর্মকর্তা আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন: 'আপনার কি মনে হয় না যে, শিক্ষার মাধ্যম বাংলা করে আমরা ভুল করেছি?' আমার জবাব শুনে তিনি বলেছিলেন : 'অবশ্য আপনি বাংলার লোক— এই কথাই বলবেন। জাপানিরা কিন্তু এখন খুব করে ইংরেজি শিখছে। আমার তো মনে হয়, বাংলা-বাংলা করে আমরা জাতিকে পিছনে ঠেলে দিচ্ছি।'

এ রকম কথা সবসময়েই কেউ না কেউ বলতেন, এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার আশঙ্কা এই যে, স্বাধীন বাংলাদেশে এমন কথা বলার লোক বৃদ্ধি পেয়েছে। আমার ভুলও হতে পারে। তবে রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের এক সক্রিয় কর্মীকেও বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরে এ ধরনের কথা বলতে শুনেছি। তাই ভয় হয়।

বাংলাভাষা সম্পর্কে এই বক্তব্যের পরিপূরক হলো বাংলাদেশ সম্পর্কে অনেকের গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধি। মাস ছয়েক আগে এক বিদ্বজ্জনসভায় প্রদত্ত মুদ্রিত ভাষণে আমাদের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বলেন :

> The birth of Bangladesh on the basis of a separate linguistic cultural identity and a professed secularism incorporated in the Constituion raised new and fresh questions on the problems of Identity and her cultural links with Islam. But this commitment to Bengali nationalism and secularism had a very brief spell and was followed by a commitment to an ideal Islamic way of life.[১]

ইতিহাসের দিকে ফিরে তিনি আরো বলেন :

> When in the 19th century the elitist proponents advocated Urdu as the language of the educated Bengali Muslim, there were angry youngmen who, though devoutly Muslim, advocated the cause of the native tongue, Bangla.[২]

ভয় হয়, একুশে ফেব্রুয়ারির রক্তদানও অচিরে রাগী নেটিভ তরুণদের কাণ্ড বলে গণ্য হবে।

তাই আজ আবার পুরোনো কথাগুলো নতুন করে উত্থাপন করতে চাই। একুশে ফেব্রুয়ারির আত্মদান কি হুজুগের ফল ছিল? নাকি সমাজের বিকাশধারায় তা ছিল অবধারিত? একুশের পথ ধরে কি অনিবার্য ছিল বাংলাদেশের জন্ম? বাংলাদেশে, আমাদের স্বাধীন মাতৃভূমিতে, প্রার্থিত আসনে কি অধিষ্ঠিত হতে পারবে মাতৃভাষা?

এক

বাংলাভাষা সম্পর্কে আমাদের সামাজিক মনোভাবের ইতিহাস সন্ধান করতে গেলে কয়েক শ বছর পেছনে তাকিয়ে দেখতে হবে। অষ্টাদশ পুরাণ ও রামচরিত ভাষায় অনুবাদ করলে রৌরব নরকে যেতে হবে বলে এক সময়ে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা ভয় দেখিয়েছিলেন। কিন্তু কৃত্তিবাসের মতো ব্রাহ্মণ ও মালাধর বসুর মতো কায়স্থ (উভয়েই পঞ্চদশ শতাব্দীর) তা গ্রাহ্য করেননি। কিতাবের কথা ভাষায় অনুবাদ করলে ঘাড়ে দোষ পড়বে, এমন আশঙ্কার উল্লেখ করেছিলেন শাহ্ মুহম্মদ সগীর (পঞ্চদশ শতাব্দী?) ও আবদুন নবী (সপ্তদশ শতাব্দী)। তবে সজ্ঞানে সেই অপ্রিয় কাজটি করেছিলেন উভয়েই। এই পটভূমিকাতেই ষোল শতকের কবি সৈয়দ সুলতান বলেছিলেন ঃ

যারে যেই ভাষে প্রভু করিল সৃজন।
সেই ভাষে হয় তার অমূল্য রতন।।

তাঁর সমকালীন কবি হাজী মুহম্মদ উপদেশ দিয়েছিলেন, 'দেশী ভাষা দেখি মনে না করিও ঘীণ'। আর সতেরো শতকের কবি আবদুল হাকিম তো দুর্বাক্যই প্রয়োগ করেছিলেন ঃ

যে সবে বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সব কাহার জন্ম নির্ণএ না জানি।।
দেসি ভাষা বিদ্যা যার মনে না যুয়াএ
নিজ দেস ত্যাগি কেন বিদেস না জাএ।।[৩]

আঠারো-উনিশ শতকে এ-কথাটাই মধুর করে বলেছিলেন রামনিধি গুপ্ত ঃ

নানান দেশের নানান ভাষা
বিনা স্বদেশী ভাষা
পুরে কি আশা?

ধ্রুপদী ভাষার প্রতি ধর্মগত ও প্রথাসিদ্ধ ভক্তি ছাড়াও, রামনিধি গুপ্তের জীবদ্দশায়, ইংরেজি ভাষার প্রতি নতুন আকর্ষণ জেগেছিল সমাজে। তাই 'দেশের ভাষার প্রতি সকলের দ্বেষ' দেখে দুঃখিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত উপদেশ দিয়েছিলেন,

জানিলে জাতীয় বিদ্যা সুখ তাহে নানা
থাকিতে উজ্জ্বল নেত্র কেন হও কানা?[৪]

জেগে যেমন বেশিক্ষণ ঘুমানো যায় না, তেমনি নেত্র উজ্জ্বল হলে বেশিক্ষণ না দেখে পারা যায় না। তাই প্রসিদ্ধি-অনুযায়ী যে-মধুসূদন বাংলাভাষা সম্পর্কে মন্তব্য

করেছিলেন, 'It is the language of Fishermen, unless you import largely from Sanskrit',[৫] তিনিই পরে 'মাতৃভাষারূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে' বলে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। তাই ইংরেজি ভাষায় পাণ্ডিত্যের জন্যে একদা 'ইংরাজী খাঁ' নামে অভিহিত রাজনারায়ণ বসু বন্ধুদের সঙ্গে মিলে জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা স্থাপন করে পয়লা জানুয়ারির বদলে পয়লা বৈশাখের অনুষ্ঠান প্রবর্তন করেছিলেন এবং বাংলা বাক্যের মধ্যে ইংরেজি শব্দ ব্যবহারের জন্যে এক পয়সা করে জরিমানার হার প্রবর্তন করেছিলেন।[৬]

ইংরেজিআনার এই অধ্রুব পরিমণ্ডল থেকে যে-মহাপুরুষ আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তিনি রবীন্দ্রনাথ। যেকালে ইংরেজি পড়ার ধুম, সেকালে ভালো করে বাংলা পড়ার ফলেই যে তাঁর সমস্ত মনটা চলবার শক্তি পেয়েছিল, এ কথা উল্লেখ করে, সেজদাদার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছিলেন তিনি *জীবনস্মৃতিতে*।[৭] আর সেকালের স্মৃতির সঙ্গে একালের প্রয়োজন যোগ করে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন অর্ধ শতাব্দীরও আগে, এখানে তা উদ্‌ধৃত করি ঃ

> এমনও এক সময় ছিল যখন ইংরেজি স্কুলের পয়লা শ্রেণীর ছাত্রেরা 'বাংলা জানি নে' বলতে অগৌরব বোধ করত না, এবং দেশের লোকেরাও সসম্ভ্রমে চৌকি এগিয়ে দিয়েছে। সেদিন আজ আর নেই বটে, কিন্তু বাঙালির ছেলেকে মাথা হেঁট করতে হয় শুধু 'কেবল বাংলা ভাষা জানি' বলতে। এদিকে রাষ্ট্রক্ষেত্রে স্বরাজ পাবার জন্যে প্রাণপণ দুঃখ স্বীকার করি, কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে স্বরাজ পাবার উৎসাহ আমাদের জাগেনি বললে কম বলা হয়। এমন মানুষ আজও দেশে আছে যারা তার বিরুদ্ধতা করতে প্রস্তুত, যারা মনে করে শিক্ষাকে বাংলাভাষার আসনে বসালে তার মূল্য যাবে ক'মে। ....
>
> আমার বিষয়টা সর্বসাধারণের শিক্ষা নিয়ে। শিক্ষার জলের কল চালানোর কথা নয়, পাইপ যেখানে পৌঁছয় না, সেখানে পানীয়ের ব্যবস্থার কথা। মাতৃভাষায় সেই ব্যবস্থা যদি গোষ্পদের চেয়ে প্রশস্ত না হয় তবে এই বিদ্যাহারা দেশের মরুবাসী মনের উপায় হবে কী ?
>
> বাংলা যার ভাষা সেই আমার তৃষিত মাতৃভূমির হয়ে বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে চাতকের মতো উৎকণ্ঠিত বেদনায় আবেদন জানাচ্ছি ঃ তোমার অভ্রভেদী শিখরচূড়া বেষ্টন করে, পুঞ্জ পুঞ্জ শ্যামল মেঘের প্রসাদ আজ বর্ষিত হোক ফলে শস্যে, সুন্দর হোক পুষ্পে পল্লবে, মাতৃভাষার অপমান দূর হোক, যুগশিক্ষার উদ্‌বেল ধারা বাঙালিচিত্তের শুষ্ক নদীর রিক্ত পথে বান ডাকিয়ে বয়ে যাক, দুই কূল জাগুক পূর্ণ চেতনায়, ঘাটে ঘাটে উঠুক আনন্দধ্বনি।[৮]

দুই

ভাষা সম্পর্কে বাংলা ভাষাভাষী জনসাধারণের যে মনোভাবের ধারণা আমরা দিতে চেষ্টা করেছি, তার একটা স্থূল ধর্মভিত্তিক রূপ ছিল। সংস্কৃতের প্রতি ভক্তি যদি হিন্দু সমাজে দেখা দিয়ে থাকে, তাহলে আরবি-ফারসির প্রতি শ্রদ্ধা মুসলমান সমাজের বিষয় বলে চিহ্নিত করা যায়। ইংরেজির এই ধর্মীয় ভিত্তি প্রায় ছিল না বললেই চলে। অথচ ইংরেজির প্রতি মোহাবেশ দেখা দিয়েছিল বাঙালি হিন্দু সমাজেই, উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমানকে সে মোহ আক্রমণ করেনি। এর ঐতিহাসিক কারণ ছিল এবং

একই কারণে বাঙালি মুসলমান সমাজে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল উর্দু নিয়ে। এ কথা সুবিদিত যে, হান্টার কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে নওয়াব আবদুল লতিফ বলেছিলেন যে, উর্দুকে বাংলার উচ্চ ও মধ্যশ্রেণীর মুসলমানদের মাতৃভাষা আর বাংলাকে নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের মাতৃভাষারূপে জ্ঞান করা উচিত।[৯] কিন্তু তারও প্রায় দশ বছর আগে নিতান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই *বঙ্গদর্শনের* অনামা সমালোচক লিখেছিলেন ঃ

> যতদিন উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদিগের মধ্যে এমত গর্ব্ব থাকিবে যে তাঁহারা ভিন্নদেশীয়, বাঙ্গালা তাঁহাদের ভাষা নহে, তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিবেন না বা বাঙ্গালা শিখিবেন না, কেবল উর্দ্দূ ফারসীর চালনা করিবেন, ততদিন সে [হিন্দু-মুসলমানের] ঐক্য জন্মিবে না। কেন না, জাতীয় ঐক্যের মূল ভাষার একতা।[১০]

এই মনোভাব যাঁদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল, মীর মশাররফ হোসেনের পিতা ও গ্রাম্য শিক্ষক মুন্‌শী সাহেব ছিলেন তাঁদের মধ্যে। মশাররফ হোসেনের ভাষায় ঃ

> মুন্সী সাহেব বাঙ্গালায় অক্ষর লিখিতে জানিতেন না। ... বাঙ্গালা বিদ্যাকেও নিতান্ত ঘৃণার চোখে দেখিতেন। ... আমার পূজনীয় পিতা একটি অক্ষরও লিখিতে জানিতেন না।[১১]

এই মনোভাবের একটু বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন আবদুল হামিদ খান ইউসুফজয়ী ঃ

> আমার স্বজাতি মোসলমান সমাজ আজি কালি শিক্ষার সম্বন্ধে অতীব পশ্চাদপদ। তাহাতে বঙ্গভাষা বা সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁহাদের আগ্রহ ও তেমন অভিজ্ঞতা, অভিনিবেশ নাই, প্রকারান্তরে তৎপ্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ, অমনোযোগ, ঔদাসীন্য এবং অনভিজ্ঞতাই বিলক্ষণ প্রকাশ পায়। ... বাঙ্গালা ভাষা স্ত্রীলোককে শিক্ষা দেওয়া অধিকাংশ মোসলমানই অতীব গর্হিত বলিয়া মনে করেন।[১২]

ভাবতে অবাক লাগে যে, বাংলাভাষার একজন সুপরিচিত গ্রন্থকার হয়েও মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ লিখতে পেরেছিলেন ঃ

> উর্দ্দূ ভাষা না থাকিলে আজ ভারতের মোসলমানগণ জাতীয়তাবিহীন ও কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইত, তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। বাঙ্গালা দেশের মোসলমানদিগের মাতৃভাষা বাঙ্গালা হওয়াতে, বঙ্গীয় মোসলমান জাতির সর্ব্বনাশ হইয়াছে। এই কারণে তাহারা জাতীয়তাবিহীন নিস্তেজ, দুর্ব্বল ও কাপুরুষ হইয়া গিয়াছে।[১৩]

অবশ্য রেয়াজুদ্দীন আহমদের এই রচনার প্রায় এক যুগ আগে, ১৯১৫ সালে *আল-এসলামের* একদল লেখক এই ধরনের মনোভাবের সমালোচনায় লিখেছিলেন ঃ

> মাতৃভাষার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা, বাঙ্গালী হইয়া নিজেদের মাতৃভাষা উর্দ্দু বা আরবী বলিয়া পরিচয় দেওয়া, কিম্বা 'বাঙ্গালা জানি না বা ভুলিয়া গিয়াছি', এরূপ বলা— এই মারাত্মক রোগ কেবল একশ্রেণীর মুসলমানের মধ্যেই দেখা যায়।[১৪]

পরিবেশের মধ্যে এই প্রতিকূলতা ছিল বলে মাতৃভাষার পক্ষে যাঁরা প্রথম দিকে কথা বলেছিলেন, তাঁরা ছিলেন নিম্নকণ্ঠ। যেমন, *হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্ম্মনীতির* (১৮৮৯) আখ্যাপত্রে একটি ফারসি উদ্‌ধৃতি ও তার বঙ্গানুবাদ ব্যবহার করে শেখ আবদুর রহিম প্রাচীন কবিদের মতোই কৈফিয়ৎ দিয়েছিলেন ঃ

> ধর্ম্মের কথা হিব্রু ভাষায় বল, আর সিরিয়ান ভাষায় বল, অথবা সত্যানুসন্ধান জাবালকা দেশে কর, আর জাবালসা দেশেই কর, তাহাতে ধর্ম্মের বা সত্যের কোন তারতম্য হয় না।[১৫]

তেমনি, ১৯০২ সালে ইসমাইল হোসেন সিরাজী লিখেছিলেন ঃ

বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গীয় মুসলমানদিগের মাতৃভাষা বাঙ্গালায় পরিণত হইয়াছে।[১৬]

১৯১৬ সালে এরই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই আবদুল মালেক চৌধুরীর কণ্ঠে ঃ

আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ আরব, পারস্য, আফগানিস্থান অথবা তাতারের অধিবাসীই হউন আর এতদ্দেশবাসী হিন্দুই হউন, আমরা এক্ষণে বাঙ্গালী, আমাদের মাতৃভাষা বাঙ্গালা।[১৭]

কিন্তু ১৯০৩ সালে *নবনূর* খুব জোর দিয়ে বলেন ঃ

বঙ্গভাষা ব্যতীত বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা আর কি হইতে পারে? যাঁহারা জোর করিয়া উর্দ্দুকে বঙ্গীয় মুসলমানদের মাতৃভাষার আসন প্রদান করিতে চান, তাঁহারা কেবল অসাধ্য সাধনের জন্য প্রয়াস করেন মাত্র।[১৮]

১৯১৫ সালে মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী লেখেন ঃ

বাঙ্গালী মুসলমানের মাতৃভাষা বাঙ্গালা, ইহা দিনের আলোর মতো সত্য। ভারতব্যাপী জাতীয়তাসৃষ্টির অনুরোধে বঙ্গদেশে উর্দ্দু চালাইবার প্রয়োজন যতই অভিপ্রেত হউক না কেন, সে চেষ্টা আকাশে ঘর বাঁধিবার ন্যায় নিষ্ফল।[১৯]

পর বছর মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর স্পষ্টোক্তি ঃ

জীবিতা বাঙলাকে মৃতা মনে করিয়া উর্দ্দুর চাদরে ঢাকিয়া রাখিবার যতই চেষ্টা করা হোক না কেন, বাঙলা উর্দ্দুর চাদর গা ঝাড়া দিয়া ফেলিয়া যখন উঠিবে, তখন তাহাকে চাপিয়া রাখা যাইবে না।[২০]

১৯১৭ সালে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বলেন ঃ

পৃথিবীর ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখ, মাতৃভাষার উন্নতি ব্যতীত কোনও জাতি কখনও কি বড় হইতে পারিয়াছে? আরব পারস্যকে জয় করিয়াছিল। পারস্য আরবের ধর্ম্মের নিকট মাথা নত করিয়াছিল, কিন্তু আরবের ভাষা লয় নাই ...।

অনেকদিন পূর্বে উর্দ্দু বনাম বাংলা মোকদ্দমা বাংলার মুসলমান সমাজের ভিতর উঠিয়াছিল; তাহাতে বাংলার ডিক্রী হইয়া যায়। বর্তমানে আবার সেই মোকদ্দমার ছানি বিচারের জন্য উর্দ্দু পক্ষকে সওাল জওাব করিতে শুনিতেছি। ... দখল বাংলারই থকিবে তবে উর্দ্দু বাংলার অধীনে উপযুক্ত করে ইচ্ছাধীন প্রজাই স্বত্বে কিছু বন্দোবস্ত পাইতে পারে।[২১]

তার পরের বছরে মোহাম্মদ আকরম খাঁ বললেন ঃ

দুনিয়ায় অনেক রকম অদ্ভুত প্রশ্ন আছে। "বাঙালী মুছলমানের মাতৃভাষা কি? উর্দু না বাঙ্গালা?" এই প্রশ্নটা তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা অদ্ভুত। নারিকেল গাছে নারিকেল ফলিবে, না বেল? ..... বঙ্গে মোছলেম ইতিহাসের সূচনা হইতে আজ পর্য্যন্ত বাংলা ভাষাই তাঁহাদের লেখ্য ও কথ্য মাতৃভাষারূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও মাতৃভাষারূপে ব্যবহৃত হইবে।[২২]

উর্দু ভাষা নিয়ে এই প্রলম্বিত বিতর্কের পটভূমি একটু স্পষ্ট করে তোলা দরকার। আত্মপরিচয়ের ভ্রান্ত উপলব্ধি থেকে যাঁরা উর্দুকে মাতৃভাষারূপে জ্ঞান করেছিলেন, তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন যেমন নিতান্ত অল্প, তেমনি শ্রোতাও পেয়েছিলেন নগণ্যসংখ্যক। কিন্তু উনিশ শতক থেকেই অনেকের মনে এই ধারণা কাজ করছিল যে, বাঙালি মুসলমানের জন্যে অন্তত পাঁচটি ভাষা শিক্ষা করা আবশ্যক। ধর্মের ভাষা আরবি, সংস্কৃতির ভাষা ফারসি, সর্বভারতীয় যোগাযোগের ভাষা উর্দু, রাজভাষা ইংরেজি এবং মাতৃভাষা

বাংলা।[২৩] এতগুলো ভাষা কী করেই বা একজন শিখবে এবং কোন ক্রম-অনুযায়ী শিখবে, তাই ছিল ভাবনার বিষয়। বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা যে বাংলা, এ কথা স্বীকার করেও অনেকে উর্দুকে ভাব-বিনিময়ের মাধ্যমরূপে মর্যাদাদানের এবং সেই ভাষাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপরে গুরুত্ব আরোপ করলেন। ১৯১৮-তে *আল-এসলামের* এক প্রবন্ধ-লেখক ঘোষণা করেন যে, 'ভারতবাসী হিসাবে উর্দ্দু না শিখিবার উপায় নাই।'[২৪] আঞ্জুমান ওলামায়ে বাঙ্গালার তৃতীয় অধিবেশনের সভাপতির মতে 'জাতি হিসাবে উন্নতি লাভ করিতে হইলে উর্দ্দু শিক্ষা করা কর্ত্তব্য'।[২৫] *আল-এসলামের* সম্পাদকীয় মন্তব্য উর্দু শিক্ষার অপরিহার্যতার ওপরে জোর দিয়েছিল।[২৬] মোহাম্মদ আকরম খাঁও স্বীকার করেছিলেন যে, 'ভারতবর্ষে মোছলেম জাতীয়তা রক্ষা ও পুষ্টির জন্য আমাদের উর্দুর দরকার।'[২৭] মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ও উর্দুকে 'ভারতীয় আন্তর্জনীন ভাষা' বলে অভিহিত করেই বাংলার অধীনে 'প্রজাই স্বত্বে' বন্দোবস্ত করে দেবার কথা বলেছিলেন।[২৮]

কিন্তু এ-নিয়ে প্রবল আপত্তিও দেখা দিয়েছিল। *আল-এসলামেই* ১৯১৯-এ শেখ আবদুল গফুর জালালি লেখেন ঃ 'পারসী ও উর্দ্দু ভাষার কোন বিশেষ আবশ্যকতা নাই।'[২৯] দু বছর পর মোহাম্মদ লুৎফর রহমান যা লেখেন, তাতে যুক্তির চেয়ে প্রতিক্রিয়ার অভিব্যক্তিই ছিল বেশি ঃ

> গৃহের পার্শ্বে উর্দ্দুর কলহাসি আমরা নিত্যই শুনি, কিন্তু তাহাতে বাঙালী মোসলমানের হৃদয়তন্ত্রীতে প্রতিধ্বনি জাগে না। ...
>
> যাঁহারা উর্দ্দু বলিয়া থাকেন তাঁহাদের মধ্যে আমার বিশ্বাস চিত্তের প্রসারতা ও দৃষ্টির খুব অভাব।[৩০]

আর মোজাফ্ফর আহ্মদ যেন কিছুটা ক্রোধের সঙ্গেই বলেন ঃ

> বাংলাদেশে আমরা উর্দ্দুকে কখনও প্রশ্রয় দিতে পারি না। সখ করিয়া যিনি শিখিতে চান, শিখুন, কিন্তু উর্দ্দু এদেশের জন্য প্রয়োজনীয় ভাষা নহে।[৩১]

এই প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ আরো স্পষ্ট বোঝা যায় রেয়াজুদ্দীন আহমদের খেদোক্তি থেকে ঃ

> আমাদের নব্যশিক্ষিত তরুণ সাহিত্যিক দল আরবী পারসীর সঙ্গে অপরিচিত। যুবকবৃন্দ উর্দ্দু ভাষার নাম শুনিলেই নাক সিটকাইয়া থাকেন, এবং শিহরিয়া উঠেন। অনেকে উর্দ্দু-পারসীর বিরুদ্ধে গরলোদ্গার করিতেও কুণ্ঠিত হন না।[৩২]

এই অবস্থায় ১৯২৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলমান ছাত্রদের জন্যে উর্দুভাষা বাধ্যতামূলক করার চেষ্টা হয়, কিন্তু প্রতিবাদের ফলে সে-প্রয়াস সফল হয়নি। *মাসিক মোহাম্মদীর* মতো রক্ষণশীল পত্রিকাও তখন প্রস্তাবিত ব্যবস্থাকে 'গোদের উপর বিষফোড়া' বলে অভিহিত করেন এবং ঘোষণা করেন যে, বাংলার মুসলমান সমাজ কখনোই তা মেনে নেবে না।[৩৩] এমন কি, মুসলিম সাহিত্য সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে ইংরেজিতে অভ্যর্থনা সমিতির ভাষণ দিয়ে মাহমুদ হাসান বলেন ঃ

> মাতৃভাষার চর্চা না করলে কোন জাতি উন্নতি করতে পারে না। ... বাংলাদেশে জোর করে উর্দ্দুকে মাতৃভাষা করতে চাওয়ার মত আহাম্মকি আর নেই।... বাংলার মুসলমান এতদিন অনর্থক উর্দ্দুর পিছু পিছু ছুটে মারাত্মক ভুল করেছে। তাই আজ তারা অন্যান্য

প্রদেশের মুসলমানদের চেয়ে অনুন্নত।[৩৪]

আর এস্. ওয়াজেদ আলি খুব আশা নিয়ে লেখেন ঃ

উর্দ্দু আর বাঙ্গালার কলহ এখন এক রকম শেষ হয়ে গেছে। বাঙ্গালাদেশে উর্দ্দু ভাষা প্রচলনের চেষ্টা যাঁরা করেছিলেন, তাঁরা তাঁদের প্রয়াসের নিষ্ফলতার কথা বুঝতে পেরে, নিজেদের সংযত করে নিয়েছেন। ভবিষ্যতে আবার সে চেষ্টা যে কেউ করবে, তার বড় একটা সম্ভাবনা নাই।[৩৫]

ভাষা-বিতর্কের আরেকটা ঢেউ জেগেছিল ১৯১৮ সালে। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ লিখেছিলেন, 'মাতৃভাষাকে জাতীয় ভাষার স্থলে বরণ করা ব্যতীত কোন জাতি কখনও উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতে পারে না!'[৩৬] তাঁর বক্তব্যের প্রতিবাদেই কিনা জানি না, *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকায়* মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী সরোষে লিখলেন ঃ

বাঙলার অতিভক্ত কেহ কেহ বাঙলাকে মাত্র মাতৃভাষার আসনে বসাইয়া সন্তোষ লাভ করিতে পারিতেছেন না। তাঁহারা বলেন, বাঙলা বাঙালী মুসলমানের কেবল মাতৃভাষা নহে, জাতীয় ভাষাও বটে। .. আবরী চিরকাল আমাদের জাতীয় ভাষা ছিল এবং থাকিবে, উহাকে বিদেশীয় নূতন আমদানী বলা কখনই সঙ্গত হইবে না।[৩৭]

কিন্তু সর্ষের মধ্যেই ভূত দেখা গেল। ঐ প্রবন্ধ ছাপিয়ে সম্পাদক টীকা সংযোজন করে বললেন ঃ

বাঙ্গালা ভাষা বাঙ্গালা দেশের সমগ্র অধিবাসীর জাতীয় ভাষা। ... আমরা আরবী ভাষাকে আমাদের National Language বলিতে কিছুতেই রাজী নহি। উহা ত চিরদিন আমাদের Universal Language (বিশ্বভাষা) হইয়াই আছে।[৩৮]

মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী এই বিতর্কের জের টানেন *আল-এসলাম* পত্রিকায় আর ওই মন্তব্যের জন্যে দায়ী করেন মোহাম্মদ মোজাম্মেল হককে।[৩৯] কেননা, তিনি দেখালেন, পত্রিকার অপর সম্পাদক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এর আগেই আরবিকে মুসলমান জাতির জাতীয় ভাষা বলে অভিহিত করেছিলেন।[৪০] ওয়াজেদ আলী নিজের বক্তব্যের সমর্থনে আকরম খাঁকেও উদ্‌ধৃত করলেন ঃ "মুছলমানের জাতীয় ভাষা যে আরবী, এ কথা ভুলিলে মুছলমানের সর্ব্বনাশ হইবে।"[৪১]

কিন্তু যে-বিষয়ে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মোহাম্মদ আকরম খাঁ এবং আরো অনেকের সম্পূর্ণ মতৈক্য ছিল, তা শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে। মাতৃভাষাই যে শিক্ষার সকল স্তরের বাহন হওয়া উচিত, শুধু সেকথা বলেই তাঁরা ক্ষান্ত হননি, অন্তত ১৯১৮ সাল থেকে বারংবার তার বাস্তব প্রয়োগ দাবি করেছিলেন।[৪২] বাংলাভাষী ছাত্রদেরকে উর্দু-মাধ্যমে মাদ্‌রাসা-শিক্ষাদানের প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে *সওগাত* পত্রিকা প্রতিবাদ জানান ১৯২৬-এ।[৪৩] মাতৃভাষাকে সকল পর্যায়ের শিক্ষার মাধ্যমরূপে গ্রহণ করার জন্যে *শিখা* গোষ্ঠীও সংগঠিত আন্দোলন চালিয়েছিলেন ওই সময় থেকেই ।[৪৪]

এই পটভূমিকায় এটা মোটেও আশ্চর্যজনক ছিল না যে, রামের জন্মের আগে রামায়ণের মতো, পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠার আগেই তার রাষ্ট্রভাষার বিষয়টি আলোচিত হয়। মাউন্টব্যাটেন-পরিকল্পনা ঘোষণার পরই আবদুল হক ও মাহবুব জামাল জাহেদীর

মতো তরুণ লেখক এবং মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতো প্রবীণ শিক্ষাবিদ দেশের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে স্বীকৃতিদানের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন, *মিল্লাত* ও *ইত্তেহাদ* পত্রিকা সেই মত প্রকাশ করেন এবং গণ-আজাদী লীগের ঘোষণাপত্রে এই দাবি লিপিবদ্ধ হয়। আর কয়েক মাসের মধ্যেই কাজী মোতাহার হোসেন ও মুহম্মদ এনামুল হক, ফররুখ আহমদ ও আবুল মনসুর আহমদ এই দাবির পক্ষে লেখেন, তমদ্দুন মজলিস সাংগঠনিক উদ্‌যোগ গ্রহণ করে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং ১৯৪৭-এর অক্টোবর মাসে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়।[৪৫]

এমনি করে দীর্ঘকালের ভিত্তির ওপরে রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলনের ইমারত ধীরে ধীরে মাথা তোলে।

তিন

রাষ্ট্রভাষার যে-আন্দোলন ১৯৪৭ সালে অঙ্কুরিত হয়েছিল, ১৯৫২ সালে তা পরিণত হয় মহীরুহে। একুশে ফেব্রুয়ারির মহৎ আত্মদানের পরে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবি আর উপেক্ষা করা সম্ভবপর ছিল না। সম্ভবপর ছিল শুধু তার কার্যকরতা বিলম্বিত করা। সে-চেষ্টার ত্রুটি হয়নি।

বায়ান্নো সালের ভাষা-আন্দোলন কিন্তু আমাদের চেতনার অনেকগুলো দিক পরিপুষ্ট করেছিল। বিশে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাংলাভাষার দাবি যাদেরকে তেমন করে স্পর্শ করতে সমর্থ হয়নি, সরকারের চণ্ডনীতি তাদের অস্তিত্বের মূল ধরে টান দিয়েছিল। রূঢ় আঘাতের চরম বেদনার মধ্যে দিয়ে আমরা নিজেদের বাঙালি সত্তা সম্পর্কে সজাগ হয়েছিলাম। পরে যতই সাংস্কৃতিক নিপীড়ন ঘটেছে, আমাদের বাঙালিত্ব ততই প্রবল হয়েছে।

এই বাঙালি সত্তার অপরিহার্য অংশ ছিল অসাম্প্রদায়িক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হওয়া। ধর্মনিরপেক্ষতার বোধ ভাষা-আন্দোলনেরই মহৎ অবদান। ১৯৫২ সালের শুরুতে যুবলীগ ছাড়া দেশে কোনো অসাম্প্রদায়িক জন-সংগঠন ছিল না। একুশে ফেব্রুয়ারির পরে ছাত্র ইউনিয়নের জন্ম হয়, গণতন্ত্রী দলের প্রতিষ্ঠা ঘটে। উভয়েরই দ্বার সকল ধর্মের মানুষের জন্যে খোলা ছিল। তারপরে মুসলিম ছাত্রলীগ পরিণত হয় ছাত্রলীগে, আওয়ামী মুসলিম লীগ হয় আওয়ামী লীগ। আর নতুন যেসব উল্লেখযোগ্য সংগঠন ও রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে ধমবর্ণনির্বিশেষে সকল স্ত্রীপুরুষের প্রবেশাধিকার ছিল।

ভাষা-আন্দোলনের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ছিল গণতান্ত্রিক আদর্শ। সকল ভাষার সমান মর্যাদার কথা সেদিন বারে বারে বলা হয়েছে। রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই ধ্বনিতে বোঝানো হয়েছিল অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে বাংলার স্বীকৃতি চাই। এ আন্দোলন কোনো ভাষা বা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আন্দোলন ছিল না। সকল নাগরিকের অধিকারের স্বীকৃতি এর মাধ্যমে দাবি করা হয়েছিল।

কিন্তু এইসব প্রবণতার সঙ্গে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় নীতির কোনো মিল ছিল না। সেই নীতি আশ্রয় করেছিল অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক আধিপাত্য, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও

সাম্প্রদায়িক রাজনীতি। পূর্ব বাংলার মানুষের চেতনার সঙ্গে তার বিরোধ হয়ে পড়েছিল অপরিহার্য। পরিণামে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোই ভেঙে পড়ে।

অনেক আত্মত্যাগের মধ্যে দিয়ে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। সেদিন রাষ্ট্রের মূলনীতি নির্ধারিত হয়েছিল জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা। তেরো বছর পরে এর একটিও আর অক্ষুণ্ন নেই। আমরা বারবার করে গণতন্ত্র ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি শুনি ; 'জয় বাংলা' ধ্বনির সঙ্গে বাঙালি জাতীয়তাবাদ অন্তর্হিত হয়েছে। সমাজতন্ত্রের আদর্শ পরিত্যক্ত ; ধর্মনিরপেক্ষতার বদলে এখন আমরা ধর্মীয় আদর্শের কথা বলছি। বাংলাদেশ নামটা আছে, কিন্তু এ কোন বাংলাদেশ? বাংলাদেশ নামটা থাকবে। কিন্তু তা বাংলাদেশ হবে, না ক্ষুদ্রতর পাকিস্তানে পরিণত হবে, তা নির্ভর করবে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ আমরা কতটুকু বাঁচিয়ে রাখতে পারবো, তার ওপর। বাংলাদেশ হবে কিনা, তা নির্ভর করবে জীবনের সকল স্তরে মাতৃভাষার প্রয়োগ কতোখানি সফল হচ্ছে, তার ওপর।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবার অল্প সময়ের মধ্যে আমরা বাংলায় সংবিধান রচনা করেছিলাম, পরিকল্পনার দলিলগুলো বাংলায় তৈরি করেছিলাম। তারপর আবার এমন সময় এসেছে, যখন রাষ্ট্রের উচ্চতম পর্যায়ে ইংরেজিতে কাগজপত্র পেশ করার নির্দেশ এসেছিল, সংবিধানের সংশোধনী রচিত হয়েছিল ইংরেজিতে। বাংলা ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা অনেকখানি পিছনে হেঁটে গিয়েছিলাম। জনগণের সচেতন প্রতিবাদ ছিল এই বিপরীতমুখী যাত্রায়। এর একটা সুফলও ফলেছে। বাংলাদেশ সরকারের সংস্থাপন ও পুনর্গঠন মন্ত্রণালয় বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন সেল গঠন করেছে। এই সেল ১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে *সরকারী কাজের সকল স্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের কর্মসূচী—প্রথম পর্যায়* প্রকাশ করেছেন। এই কর্মসূচি অভিনন্দনযোগ্য। আমার মনে হয়েছে, এটি অত্যন্ত বাস্তবসম্মত ও গঠনমূলক কর্মসূচি। কিন্তু সেই সঙ্গে আমার সন্দেহও হয়েছে যে, এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের পথে যেসব বাধা আছে, তা আমরা দূর করতে পারবো কিনা।

সরকারি কাজের বাইরেও তো প্রশস্ত কর্মক্ষেত্র রয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্র, আইন-আদালত, ব্যাংক। সব জায়গায় কিছু অগ্রগতি যে হয়নি, তা নয়। কিন্তু বেশি দূর এগোনো যায়নি।

কেন এমন হয়? কোথায় ত্রুটি? বাংলাভাষার ? না, আমাদের আয়োজনের? ইতিহাসের দিকে একটু ফিরে তাকানো যাক।

চার

জীবনের সকল ক্ষেত্রে এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল শাখায় আজ আমরা বাংলাভাষার প্রয়োগ দাবি করছি। কিন্তু এ কথা মনে করলে ভুল হবে যে, এই কাজ আমরাই প্রথম করতে যাচ্ছি। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, জীবনে এবং জ্ঞানচর্চায় এক সময়ে বেশ সংগঠিতভাবে বাংলা ভাষার ব্যবহার করা হয়েছিল। বাংলাদেশের শাসনকর্তাদের সঙ্গে প্রতিবেশী রাজ্যের শাসকদের বাংলায় পত্র-বিনিময়ের একটা ধারা ষোল থেকে আঠারো শতক পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়।[৪৬] ১৭৮৫ থেকে অন্তত ১৮৫৫ পর্যন্ত প্রায় অবিচ্ছিন্ন ধারায় দেশের সকল প্রচলিত আইনের অনুবাদ হয়ে এসেছে বাংলা ভাষায়। উনিশ শতকের

শুরু থেকে বাংলা ভাষায় নানারকম জ্ঞানের বই রচিত ও অনূদিত, পঠিত ও ব্যবহৃত হয়ে এসেছে।

কিভাবে এমন হতে পেরেছিল এবং কেনই বা তার স্রোত ব্যাহত হলো, সে-বিষয়টি আলোচনার যোগ্য। একক প্রচেষ্টা ও ব্যক্তিগত সামর্থ্যের মূল্য স্বীকার করেও বলবো যে, প্রাতিষ্ঠানিক উদ্‌যোগ যেমন এই ধারাকে বেগবান করে তুলেছিল তেমনি তার অভাব এই ধারাকে লুপ্ত করে। কথাটা ভেঙে বলা দরকার! আইনের অনুবাদের কথা ধরা যাক। আইনের অনুবাদ যে অত আগে শুরু হয়েছিল, তার মূলে ছিল ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনকালে গৃহীত কোম্পানি-প্রশাসনের বা সপারিষদ গভর্নর-জেনারেলের নীতি ও উদ্‌যোগ। কলকাতায় সুপ্রিম কোর্টের প্রতিষ্ঠার পরে যখন নতুন করে দেওয়ানি, ফৌজদারি ও রাজস্ব আইন প্রণীত হতে থাকলো, তখন এটা স্থির হয় যে, সঙ্গে সঙ্গে ফারসি ও বাংলা ভাষায় এসব আইনের অনুবাদ প্রকাশ করা দরকার।[৪৭] অতএব শুরু হলো অনুবাদ। ১৮৩৭ খ্রিষ্টাব্দে যখন রাজভাষা হিসেবে ফারসির আসন আর রইলো না, তখন ১৮৩৮ সালের ২৩ জানুয়ারি সরকার এক নির্দেশ জারি করে বললেন:

> ..ফোর্ট উলিয়ম রাজধানীর অন্ত:পাতি বঙ্গাদি তাবৎ প্রদেশে আদালত ও রাজস্ব সম্পর্কীয় কার্য্যে পারস্য ভাষার পরিবর্ত্তে দেশীয় ভাষার চলন হইবে এবং এইরূপ পরিবর্ত্তনকরণার্থ ১ জানুয়ারি তারিখ অবধি ১২ মাস নির্দ্দিষ্ট হইল। ...
>
> শ্রীলশ্রীযুক্তের জ্ঞাপনার্থ এই নিয়ম সম্পাদননিমিত্ত যেরূপ উদ্যোগ হইয়াছে তাহার এক রিপোর্ট আগামি ১ জুলাই তারিখে এবং তৎপরে ১৮৩৯ সালের ১ জানুয়ারি তারিখে দিতে হইবে।[৪৮]

অর্থাৎ ফারসি থেকে বাংলায় পরিবর্তনের জন্যে সময় দেওয়া হয়েছিল প্রকৃতপক্ষে এক বছরেরও কম এবং দাবি করা হয়েছিল ছয় মাসের কিস্তিতে অগ্রগতির প্রতিবেদন। শুধু তাই নয়। আরেকটি আদেশ জারি করে বলা হয় যে, 'দেশীয় প্রত্যেক জিলায় কোন আমলা দেশীয় ভাষায় সুবিজ্ঞ না হইলে তাঁহাকে কর্ম্মযোগ্য বোধ করা যাইবে না।'[৪৯] এভাবে আদালতে বাংলাভাষা যে চালু হলো, নিম্ন আদালতে আজও তা বহাল রয়ে গেছে।

জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে দুটি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। এর মধ্যে প্রথম হচ্ছে ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি এবং অপরটি ১৮১৮ সালে স্থাপিত শ্রীরামপুর কলেজ। বাংলা ভাষায় সাহিত্য ও ইতিহাস, দর্শন ও ধর্ম, ব্যাকরণ ও অভিধান, তত্ত্বীয় ও ব্যবহারিক বিজ্ঞান-সংক্রান্ত বইপত্র এবং বিশ্বকোষ-জাতীয় গ্রন্থপ্রকাশের সযত্ন ও সচেতন প্রয়াস এঁরা নিয়েছিলেন। বাংলা ভাষার মাধ্যমে দেশীয় ও ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান-চর্চার উদ্দেশ্যে আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠান দেখা দেয়। যেমন, গৌড়ীয় সমাজ (১৮২৩), অ্যাকাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন (১৮২৮), সর্ব্বতত্ত্বদীপিকা সভা (১৮৩২), সাধারণ জ্ঞানোপার্জ্জিকা সভা (১৮৩৮), তত্ত্ববোধিনী সভা (১৮৩৯), বেথুন সোসাইটি (১৮৫০), বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ (১৮৫১) ও বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা (১৮৬৭)।[৫০] এসব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মধ্যে প্রকাশনার ক্ষেত্রে বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ বা Vernacular Literature Committee (পরে Society) — যাঁরা বিশ্বাস

করতেন যে, The resources of the Bengali language are unbounded — সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।[৫১]

এইসব সরকারি ও বেসরকারি উদ্‌যোগের ফল কী হয়েছিল, দেখা যাক। আইনের প্রথম অনুবাদ করেন জোনাথান ডানকান, ১৭৮৫ সালে। পরিভাষাও নিজে তৈরি করে নেন। ডানকান, মেয়ার, এড্‌মনস্টোন, ফর্‌স্টার এবং অন্যেরা আইনের উনিশটি অনুবাদ প্রকাশ করেন আঠারো শতকেই। পরিভাষায় কিছু কিছু পার্থক্য হয়েছিল একজনের সঙ্গে অন্যের। পরে কিন্তু এই পার্থক্য দূর হয়ে যায়।[৫২] উনিশ শতকের শেষার্ধে বেসরকারি উদ্‌যোগে আইন-সংক্রান্ত কিছু উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা দেখা যায়। ১৮৬৭-তে বাংলায় সাপ্তাহিক ল রিপোর্ট প্রকাশ করেন অভয়বন্ধু বসু। তাছাড়া আইনের ব্যাখ্যামূলক বইও বের হতে থাকে। যেমন, আশুতোষ বিশ্বাসের *ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইন* (১৮৯৩), যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের *ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য বিষয়ক আইন* (১৮৯৩), নীলকমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের *ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন* (১৮৯৪), এবং রজনীকান্ত সেন ও ডি. এন. মিত্রের *মহম্মদীয় আইন* (১৮৯৮)।[৫৩]

দেশি ভাষায় স্কুলের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশের জন্যে ১৮১৭ সালে কলকাতা স্কুল-বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরবর্তী পঁচিশ বছর ধরে তাঁরা বহু বই প্রকাশ করতে থাকেন। মুখ্যত এই সোসাইটির সম্পাদক উইলিয়ম ইয়েট্‌সের পরামর্শেই কোম্পানি-সরকার কাউনসিল অফ এডুকেশনের একটি উপসংঘ গঠন করেন Section of the Council of Education for the preparation of Vernacular Books নামে, বোধহয় ১৮৪০-এর দিকে। ইয়েট্‌সের প্রস্তাব ছিল এই যে, বিভিন্ন শ্রেণীর জন্যে আগে ইংরেজিতে পাঠ্যবই সংকলন করা হবে, তারপর এই উপসংঘের তত্ত্বাবধানে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করে সেসবের অনুবাদ করা হবে বাংলা প্রভৃতি দেশীয় ভাষায়। সেই অনুযায়ী কাজ হয়েছিল।[৫৪] সোসাইটি ও কাউনসিলের তৎপরতার ফলে উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এবং তারপরও কিছুকাল ধরে বাংলা পাঠ্যবইয়ের কোনো অভাব হয়নি।

অন্যদিকে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের উদ্‌যোগে ১৮১৮ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীরামপুর কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ডক্টর জোশুয়া মার্শম্যানের নেতৃত্বে পরিচালিত এই কলেজে পরে প্রাণস্বরূপ হয়ে দাঁড়ান তাঁর পুত্র জন ক্লার্ক মাশম্যান আর পাদরি জন ম্যাক। জন ম্যাক উত্তরকালে লিখেছিলেন, 'for be it understood, the native youth of India are those for whom we chiefly labour; and their own tongue is the great instrument by which we hope to enlighten them.' এই নীতির অনুসরণে জে. সি. মার্শম্যান ইতিহাস-বিষয়ে এবং জন ম্যাক বিজ্ঞান-বিষয়ে বাংলা পাঠ্যবই রচনায় অগ্রসর হন। জন ম্যাকের নেতৃত্বে বাংলাভাষায় প্রথম মানচিত্র রচিত ও প্রচারিত হয়, এ কথাটা যেমন মনে রাখার যোগ্য তেমনি বাংলাভাষার মাধ্যমে প্রথম বিজ্ঞান পড়াবার কৃতিত্বও তাঁর প্রাপ্য।[৫৫]

স্কুল বুক সোসাইটি ও শ্রীরামপুর কলেজের উদ্‌যোগে রচিত পাঠ্যপুস্তকের আদর্শ অন্যেরা গ্রহণ করেছিলেন। তাই তেমন বই লেখা হয়েছিল যথেষ্ট। তবে পাঠ্যবই বলতে সেকালে বেশ উন্নতমানের গ্রন্থ বোঝাতো, বিশ্বকোষও তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে বিশ্বকোষ জাতীয় অন্তত তিনটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল।

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার পঞ্চম সংস্করণ-অবলম্বনে ফেলিক্স কেরি মাসে মাসে *বিদ্যাহারাবলী* (১৮১৯-২০) প্রচার করতে থাকেন। এর প্রথম গ্রন্থ, ৬৩৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ *ব্যবচ্ছেদবিদ্যা* ছিল শারীরতত্ত্ব-বিষয়ক প্রথম বাংলা বই। দ্বিতীয় গ্রন্থ *স্মৃতিশাস্ত্র* ছিল ব্যবহার-শাস্ত্রীয় পুস্তক; এটি অংশত প্রকাশিত হবার পরে গ্রন্থকারের মৃত্যু হয়। রাধাকান্ত দেবের *শব্দকল্পদ্রুম* (১৮১৯-৫৮) এর সমসাময়িক, তবে তা প্রকাশিত হয় আট খণ্ডে। আর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় তেরো খণ্ডে প্রকাশ করেন *বিদ্যাকল্পদ্রুম* (১৮৪৬-৫১)।

তবে বিজ্ঞান-বিষয়ে প্রথম বাংলা বই বেরিয়েছিল *বিদ্যাহারাবলী* প্রকাশেরও আগে। ১৮১৫-তে প্রকাশিত উইলিয়ম ইয়েট্সের *পদার্থবিদ্যাসার* ছিল প্রকৃতিবিজ্ঞান বিষয়ক বই। শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত *জ্যোতিষ এবং গোলাধ্যায়* এর সমসাময়িক বলে মনে করি, কেননা বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ হয় ১৮১৯-এ। লক্ষ্য করা যাবে যে, ভূগোল কথাটা তখনও প্রচলিত হয়নি, ওই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে গোলাধ্যায়। কিন্তু এরপর জে. ডি. পীয়ার্সন যখন একই বিষয়ের বই লেখেন, তখন তিনি তার নাম দেন *ভূগোল এবং জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ে কথোপকথন* (দ্বি-স ১৮২৭)। ডব্লিউ. এইচ. পীয়ার্সের *ভূগোলবৃত্তান্ত* ছাপা হয় ১৮১৮-এ । তারপর পাই অক্ষয়কুমার দত্তের *ভূগোল* (১৮৪৮) এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্রের *প্রাকৃত ভূগোল* (১৮৫৪)।

উইলিয়ম ইয়েট্সের *জ্যোতির্বিদ্যা* (১৮৩৩) ছিল জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। রসায়ন বিষয়ে প্রথম বাংলা বই ছিল জন ম্যাকের *কিমিয়াবিদ্যাসার* (১৮৩৪)। অক্ষয়কুমার দত্ত লিখেছিলেন *পদার্থবিদ্যা* (১৮৫৬)।

ভেষজ-বিজ্ঞানের প্রথম বই লেখেন রামকমল সেন। ১৮১৯-এ প্রকাশিত *ঔষধসারসংগ্রহে* তিনি ৫৫টি ওষুধের পরিচয় তুলে ধরেছিলেন। চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রথম পরিভাষা রচনা করেন পিটার ব্রিটন : *A vocabulary of the various parts of the human body and medical and technical terms* (১৮২৫)। পরে, ১৮৮৯-তে, হরিপ্রসাদ চক্রবর্তী প্রকাশ করেছিলেন *ডাক্তারি অভিধান*। তার আগে, মধুসূদন গুপ্ত (*লন্ডন ফার্মাকোপিয়া*, ১৮৪৯; *আনাটোমি*, ১৮৫৩), অন্নদাচরণ খাস্তগীর (*মানবজন্মতত্ত্ব ও ধাত্রীবিদ্যা*, ১৮৬৮), কাশীচন্দ্র গুপ্ত (*অস্ত্রচিকিৎসা*, ১৮৮১), জহিরুদ্দীন আহমদ (*অস্ত্রচিকিৎসা*, দ্বি-স ১৮৯০), নীলরত্ন অধিকারী (*নরশরীর-বিধান*, ১৮৮৭) ও রাধাগোবিন্দ কর (*সংক্ষিপ্ত শরীরতত্ত্ব*, ১৮৯৩; *ভিষগ্বন্ধু*, ১৮৯৭; *রোগী-পরিচর্যা*, ১৮৯৭, *সংক্ষিপ্ত ভৈষজ তত্ত্ব বা মেটেরিয়া মেডিকা*, ১৮৯৭) প্রমুখ বিখ্যাত চিকিৎসক এবং স্বল্পপরিচিত বিশেষজ্ঞেরা চিকিৎসাবিজ্ঞানের সকল শাখায় বাংলায় গ্রন্থ রচনা করেন।

তালিকা বাড়িয়ে লাভ নেই। আমি শুধু দেখাতে চেয়েছি যে, ব্যবহারিক জীবনে ও শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাভাষার ব্যবহার এক সময়ে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই স্রোতে ভাঁটা পড়লো কেন, তা সঠিক নির্ধারণ করার উপায় নেই। তবে আমার অনুমান এই যে, দেশের শাসনভার কোম্পানির কাছ থেকে প্রত্যক্ষভাবে মহারানীর তত্ত্বাবধানে যাওয়ার পরে ইংরেজিভাষার আধিপত্য বৃদ্ধি পায়। তাছাড়া, একই সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ঘটায় এবং তার অধীনে ইংরেজি-মাধ্যমে পরীক্ষাগ্রহণের নিয়ম

প্রচলিত হওয়ায় বাংলা বইপত্রের সমাদর কমে যায়। এখানে মনে রাখা দরকার যে, মাত্র ১৯২৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষার মাধ্যমে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার নিয়ম প্রবর্তিত হয়।

অতএব, এমন একটা সময় এলো, যখন আমরা মনে করতে শুরু করলাম যে, ইংরেজি ভাষার মাধ্যম ছাড়া সরকারি কাজকর্ম করা অসম্ভব, শিক্ষাদান অচল এবং শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া বন্ধ হয়ে যাবে। গভীর দুঃখ ও ক্ষোভের সঙ্গে তাই রবীন্দ্রনাথকে একদিন বলতে হয়েছিল :

> আসল কথা, আধুনিক শিক্ষা তার বাহন পায় নাই— তার চলাফেরার পথ খোলসা হইতেছে না। এখনকার দিনে সার্বজনীন শিক্ষা সকল সভ্য দেশেই মানিয়া লওয়া হইয়াছে। যে কারণেই হউক আমাদের দেশে এটা চলিল না। ...
>
> বিদ্যাবিস্তারের কথাটা যখন ঠিকমতো মন দিয়া দেখি তখন তার সর্বপ্রধান বাধাটা এই দেখিতে পাই যে, তার বাহনটা ইংরেজি। বিদেশী মাল জাহাজে করিয়া শহরের ঘাট পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতে পারে কিন্তু সেই জাহাজটাতে করিয়াই দেশের হাটে হাটে আমদানি রপ্তানি করাইবার দুরাশা মিথ্যা। যদি বিলিতি জাহাজটাকেই কায়মনে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাই তবে ব্যবসা শহরেই আটকা পড়িয়া থাকিবে।
>
> এ পর্যন্ত এ অসুবিধাটাকে আমাদের অসুখ বলিয়া বোধ হয় নাই। কেননা মুখে যাই বলি মনের মধ্যে শহরটাকেই দেশ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম। .....
>
> আমাদের এই ভীরুতা কি চিরদিনই থাকিয়া যাইবে? ভরসা করিয়া এটুকু কোনোদিন বলিতে পারিব না যে, উচ্চশিক্ষাকে আমাদের দেশের ভাষায় দেশের জিনিস করিয়া লইতে হইবে? ...
>
> মাতৃভাষা বাংলা বলিয়াই কি বাঙালিকে দণ্ড দিতেই হইবে? এই অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য সে চিরকাল অজ্ঞান হইয়াই থাক— সমস্ত বাঙালির প্রতি কয়জন শিক্ষিত বাঙালির এই রায়ই কি বহাল রহিল? যে বেচারা বাংলা বলে সেই কি আধুনিক মনুসংহিতার শূদ্র? তার কানে উচ্চশিক্ষার মন্ত্র চলিবে না? মাতৃভাষা হইতে ইংরেজি ভাষার মধ্যে জন্ম লইয়া তবেই আমরা দ্বিজ হই?
>
> বলা বাহুল্য ইংরেজি আমাদের শেখা চাইই — শুধু পেটের জন্য নয়। কেবল ইংরেজি কেন? ফরাসি জার্মান শিখিলে আরও ভালো। সেই সঙ্গে এ কথাও বলা বাহুল্য অধিকাংশ বাঙালি ইংরেজি শিখিবে না। সেই লক্ষ লক্ষ বাংলাভাষীদের জন্য বিদ্যার অনশন কিংবা অর্ধাশনই ব্যবস্থা, এ কথা কোন্ মুখে বলা যায়। ....
>
> আমি জানি তর্ক এই উঠিবে তুমি বাংলাভাষার যোগে উচ্চশিক্ষা দিতে চাও কিন্তু বাংলাভাষায় উঁচুদরের শিক্ষাগ্রন্থ কই? নাই সে কথা মানি কিন্তু শিক্ষা না চলিলে শিক্ষাগ্রন্থ হয় কী উপায়ে? শিক্ষাগ্রন্থ বাগানের গাছ নয় যে, শৌখিন লোকে শখ করিয়া তার কেয়ারি করিবে, — কিংবা সে আগাছাও নয় যে, মাঠে ঘাটে নিজের পুলকে নিজেই কণ্টকিত হইয়া উঠিবে। শিক্ষাকে যদি শিক্ষাগ্রন্থের জন্য বসিয়া থাকিতে হয় তবে পাতার জোগাড় আগে হওয়া চাই তারপরে গাছের পালা এবং কূলের পথ চাহিয়া নদীকে মাথায় হাত দিয়া পড়িতে হইবে।
>
> বাংলায় উচ্চঅঙ্গের শিক্ষাগ্রন্থ বাহির হইতেছে না এটা যদি আক্ষেপের বিষয় হয় তবে তার প্রতিকারের একমাত্র উপায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার উচ্চঅঙ্গের শিক্ষা প্রচলন করা। ...

জার্মানিতে ফ্রান্সে আমেরিকায় জাপানে যে সকল আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় জাগিয়া উঠিয়াছে তাদের মূল উদ্দেশ্য সমস্ত দেশের চিত্তকে মানুষ করা। দেশকে তারা সৃষ্টি করিয়া চলিতেছে। বীজ হইতে অঙ্কুরকে, অঙ্কুর হইতে শাখাকে তারা মুক্তিদান করিতেছে। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে চিত্তশক্তিকে উদ্‌ঘাটিত করিতেছে।

দেশের একজনকে মানুষ করা কোনোমতেই পরের ভাষায় সম্ভবপর নহে। আমরা লাভ করিব কিন্তু সে লাভ আমাদের ভাষাকে পূর্ণ করিবে না, আমরা চিন্তা করিব কিন্তু সে চিন্তার বাইরে আমাদের ভাষা পড়িয়া থাকিবে, আমাদের মন বাড়িয়া চলিবে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাষা বাড়িতে থাকিবে না, সমস্ত শিক্ষাকে অকৃতার্থ করিবার এমন উপায় আর কী হইতে পারে।

তার ফল হইয়াছে, উচ্চঅঙ্গের শিক্ষা যদি আমরা পাই, উচ্চঅঙ্গের চিন্তা আমরা করিনা। কারণ চিন্তার স্বাভাবিক বাহন আমাদের ভাষা। বিদ্যালয়ের বাহিরে আসিয়া পোশাকি ভাষাটা আমরা ছাড়িয়া ফেলি, সেই সঙ্গে তার পকেটে যা কিছু সঞ্চয় থাকে তা আলনায় ঝোলানো থাকে,— তারপরে আমাদের চিরদিনের আটপৌরে ভাষায় আমরা গল্প করি, গুজব করি, রাজা উজির মারি, তর্জমা করি, চুরি করি এবং খবরের কাগজে অশ্রাব্য কাপুরুষতার বিস্তার করিয়া থাকি।...

সৃষ্টির প্রথম মন্ত্র— "আমরা চাই!" এই মন্ত্র কি দেশের চিত্তকুহর হইতে একেবারেই শুনা যাইতেছে না? দেশের যাঁরা আচার্য, যাঁরা সন্ধান করিতেছেন, সাধনা করিতেছেন, ধ্যান করিতেছেন, তাঁরা কি এই মন্ত্রে কাছে আসিয়া মিলিবেন না? বাষ্প যেমন মেঘে মেলে, মেঘ যেমন ধারাবর্ষণে ধরণীকে অভিষিক্ত করে তেমনি করিয়া কবে তাঁরা একত্রে মিলিবেন, কবে তাঁদের সাধনা মাতৃভাষায় গলিয়া পড়িয়া মাতৃভূমিকে তৃষ্ণার জলে ও ক্ষুধার অন্নে পূর্ণ করিয়া তুলিবে? [৫]

সত্তর বছর আগে রবীন্দ্রনাথ যে-প্রশ্ন করেছিলেন, তার উত্তর দেওয়ার ভার আজকের বাংলাদেশের। এই সত্তর বছরে পৃথিবী যেমন অনেক এগিয়েছে, তেমনি অনেক বদল হয়েছে আমাদের দেশের। রবীন্দ্রনাথ যা জানতেন না, তা আমরা জানি। যেখানে দাঁড়িয়ে এখন কথা বলছি, তার অদূরে বাংলাভাষার মর্যাদারক্ষার জন্যে প্রাণ দিয়েছিলেন দেশের বীর সন্তানেরা। দেশ স্বাধীন করার জন্যে অগণিত নরনারী জীবন দিয়েছেন, সম্ভ্রম হারিয়েছেন। তাঁদের আত্মদান তো বৃথা যেতে পারে না। তাঁদের স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের, আমাদেরই কর্তব্য জীবনের সকল স্তরে মাতৃভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করা। সেই দায়িত্বপালনের শপথই তাঁদের কাছে আমাদের মহৎ অঙ্গীকার।

তথ্যনির্দেশ

১. M. Abdul Aziz Khan, *Presidential Address,* Workshop on Bangladesh : History, Society and Culture (Dhaka, 1984), p[1].
২. ঐ, p 4.
৩. পূর্ণ উদ্‌ধৃতির জন্যে দ্রষ্টব্য আহমদ শরীফ, *মধ্যযুগের সাহিত্যে সমাজ ও সংস্কৃতির রূপ* (ঢাকা, ১৯৭৭), পৃ ৮১—৮৩।
৪. মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পাদিত), *আমাদের মাতৃভাষা-চেতনা ও ভাষা আন্দোলন* (ঢাকা, ১৯৮৪), পৃ ২২-২৪ দ্রষ্টব্য।

৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, *মধুসূদন দত্ত* (সাহিত্য-সাধক চরিতমালা ; চতুর্থ সং কলিকাতা, ১৩৬২), পৃ ৩৩।
৬. রাজনারায়ণ বসু, *আত্মচরিত* (তৃ-স ; কলিকাতা, ১৯৫২), পৃ ৮১।
৭. *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, ১৭ (পুনর্মুদ্রণ ; কলিকাতা, ১৩৬১): ২৯৮।
৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *শিক্ষা* (পুনর্মুদ্রণ ; কলিকাতা, ১৯৭৩), পৃ ২২৩।
৯. Enamul Haque, *Nawab Bahadur Abdul Latif : His writings and Related Documents* (Dhaka, 1968), p 225.
১০. *বঙ্গদর্শন*, পৌষ ১২৮০।
১১. মীর মশাররফ হোসেন, *আমার জীবন* (কলিকাতা, ১৩১৫), পৃ ১০৩-৪।
১২. আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী, *উদাসী* (টাঙ্গাইল, ১৯০০), ভূমিকা।
১৩. মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, *হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (ছালঃ) এর জীবনচরিত* (কলিকাতা, ১৩৩৪), ভূমিকা।
১৪. খাদেমোল এস্‌লাম বঙ্গবাসী, 'বাঙ্গালীর মাতৃভাষা', *আল এসলাম*, কার্তিক ১৩২২।
১৫. শেখ আবদুর রহিম, *হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্ম্মনীতি* (কলিকাতা, ১২৯৬). আখ্যাপত্র।
১৬. এ, এম, এসমাইল হোসেন সিরাজী, 'মাতৃভাষা ও জাতীয় উন্নতি', *ইসলাম প্রচারক*, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারী ১৯০২।
১৭. আবদুল মালেক চৌধুরী, 'বঙ্গসাহিত্যে শ্রীহট্টের মুসলমান', *আল-এসলাম*, আশ্বিন ১৩২৩।
১৮. 'মাতৃভাষা ও বঙ্গীয় মুসলমান', *নবনূর*, পৌষ ১৩১০।
১৯. মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী, 'বাঙ্গালী মুসলমানের ভাষা ও সাহিত্য', *কোহিনুর*, মাঘ ১৩২২।
২০. মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, 'সাহিত্য-প্রসঙ্গ', *আল এসলাম*, মাঘ ১৩২১।
২১. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, 'দ্বিতীয় বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সম্মিলনীর সভাপতির অভিভাষণ', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, বৈশাখ ১৩২৫।
২২. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, 'তৃতীয় বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সম্মিলনীর অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, মাঘ ১৩২৫।
২৩. যেমন, নওসের আলী খাঁ ইউসফজয়ী, *বঙ্গীয় মুসলমান* (কলিকাতা, ১২৯৭), পৃ ৩৪ ; *মিহির ও সুধাকর*, ৮ পৌষ ১৩০৬।
২৪. বশারত আলী, 'উর্দ্দু-সমস্যা', *আল-এসলাম*, অগ্রহায়ণ ১৩২৫।
২৫. গোলাম কাদের 'আঞ্জুমনে-ওলামার তৃতীয় অধিবেশনের চট্টগ্রাম অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ', *আল-এসলাম*, ফালগুন-চৈত্র ১৩২৫।
২৬. *আল-এসলাম*, আষাঢ় ১৩২৬ [শেখ আবদুল গফুর জালালীর প্রবন্ধের টীকা]।
২৭. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, *পূর্বোক্ত*।
২৮. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, *পূর্বোক্ত*।
২৯. শেখ আবদুল গফুর জালালী, 'শিক্ষাবিস্তারের উপায়', *আল-এসলাম*, আষাঢ় ১৩২৬।
৩০. মোহাম্মদ লুৎফর রহমান, 'উর্দু ও বাঙ্গালা সাহিত্য', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা*, বৈশাখ ১৩২৮।
৩১. মোজাফ্‌ফর আহমদ, 'উর্দু ভাষা ও বঙ্গীয় মুসলমান', *আল এসলাম*, শ্রাবণ ১৩২৪; মুস্তাফা নূরউল ইসলাম (সম্পাদিত), *পূর্বোক্ত*, পৃ ৬২।
৩২. মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, *পূর্বোক্ত*।

৩৩. 'আলোচনা', *মাসিক মোহাম্মদী*, মাঘ ১৩৩৫।
৩৪. মাহমুদ হাসান, 'অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ', *শিখা*, দ্বিতীয় বর্ষ, ১৯২৮।
৩৫. এস, ওয়াজেদ আলি, 'বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্য সমস্যা', *মাসিক মোহাম্মদী*, বৈশাখ ১৩৩৫।
৩৬. আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বনাম বঙ্গীয় মুসলমান', *আল-এসলাম*, আশ্বিন ১৩২৫।
৩৭. মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, 'বাঙলা ভাষা ও মুসলমান সাহিত্য', *বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা'*, মাঘ ১৩২৫।
৩৮. *ঐ*, সম্পাদকের টীকা।
৩৯. মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী, 'বাঙ্গালা ভাষা ও মোছলমান সাহিত্য', *আল-এসলাম*, ফাল্গুন - চৈত্র ১৩২৫।
৪০. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্, 'ইসলামের আদর্শ ও আমাদের আশা', *আল-এসলাম*, পৌষ ১৩২৫।
৪১. মোহাম্মদ আকরম খাঁ, *পূর্বোক্ত*।
৪২. যেমন, আবদুল করিম সাহিত্যবিশাবদ, *পূর্বোক্ত* ; মোহাম্মদ আকরম খাঁ, *পূর্বোক্ত* ; মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, *পূর্বোক্ত অভিভাষণ*।
৪৩. 'বিবিধ প্রসঙ্গ', *সওগাত*, আষাঢ় ১৩৩৩।
৪৪. *শিখা*, ১৩৩৩ দ্রষ্টব্য।
৪৫. বিস্তৃত বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য, আবদুল হক, *ভাষা-আন্দোলনের আদিপর্ব* (ঢাকা, ১৯৭৬) এবং বদরুদ্দীন উমর, *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, প্রথম খণ্ড (ঢাকা, ১৯৭০)।
৪৬. আনিসুজ্জামান, *পুরোনো বাংলা গদ্য* (ঢাকা, ১৯৮৪), পৃ ৩৮-৪০;৮৩-৮৬ দ্রষ্টব্য।
৪৭. I O R Bengal Revenue Consultations. Range 50, Vol 39, f 397.
৪৮. *সমাচার দর্পণ*, ১০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৮। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), *সংবাদপত্রে সেকালের কথা* (তৃ-স ; কলিকাতা, ১৩৫৬), পৃ ২২২।
৪৯. *সমাচার দর্পণ*, ২২ জুলাই ১৮৩৭। *ঐ*, পৃ ২২১।
৫০. বিস্তৃত বিবরণের জন্য যোগেশচন্দ্র বাগল, *বাংলার নব্যসংস্কৃতি* (কলিকাতা, ১৯৫৮) দ্রষ্টব্য।
৫১. বিস্তৃত আলোচনার জন্য যোগেশচন্দ্র বাগল, *বঙ্গসংস্কৃতির কথা* (কলিকাতা, ১৯৭১), পৃ ৫৫-৮৬ দ্রষ্টব্য।
৫২. বাংলায় আইনবিষয়ক রচনা সম্পর্কে আলোচনার জন্য পূর্ণেন্দুনাথ নাথ, *বাংলাভাষায় আইনচর্চার ধারা* (কলিকাতা, ১৯৮৪) দ্রষ্টব্য।
৫৩. মুনতাসীর মামুন, 'বাংলা বইয়ের নির্বাচিত পঞ্জি : ১৯ শতক', *পরিচয়*, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৯।
৫৪. যোগেশচন্দ্র বাগল, *উইলিয়ম ইয়েট্‌স, জন ম্যাক, মধুসূদন গুপ্ত*, (সাহিত্য-সাধক চরিতমালঙ্কা ; কলিকাতা, ১৩৬৩), পৃ ১৫-১৮।
৫৫. *ঐ*, পৃ ৪৭-৪৮ ও ৫৪।
৫৬. এইসব বইয়ের বিবরণ সংকলিত হয়েছে প্রধানত সুকুমার সেন, *বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য*, (তৃ-স ; কলিকাতা, ১৩৫৬) থেকে ; যোগেশচন্দ্র বাগলের সর্বশেষোক্ত বই এবং মুনতাসীর মামুনের পূর্বোক্ত রচনাপঞ্জি থেকেও কিছু তথ্য গৃহীত হয়েছে।
৫৭. *রবীন্দ্র-রচনাবলী*, অষ্টাদশ খণ্ড (পুনর্মুদ্রণ ; কলিকাতা, ১৩৬১); ৪৯৯-৫১২।

একতা কেন?

আমার তো মনে হয়, অবস্থা এখন এমন জায়গায় দাঁড়িয়েছে যে, যদি কোনো স্কুলের ছাত্রকে শিক্ষক প্রশ্ন করেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা কে ঘোষণা করেছিলেন, সে করজোড়ে বলবে, 'আমি করিনি, স্যার।'

১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ আমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছিলাম। অসহযোগ আন্দোলন-পরিচালনার জন্য সংগ্রাম কমিটির প্রধান দপ্তর স্থাপন করা হয়েছিল চট্টগ্রাম শহরে, স্টেশন রোডের ডাকবাংলোয়। ২৬ মার্চ দুপুরে সেখান থেকে আমাকে টেলিফোন করেন অ্যাডভোকেট রফিক। বলেন, একটা জরুরি বার্তা আছে, লিখে নিন এবং ক্যাম্পাসে ও আপনাদের ওই এলাকায় প্রচারের ব্যবস্থা করুন। লিখে নিলাম। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা-ঘোষণা। আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল হান্নান সেটাই পাঠ করেন স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে। ২৭ মার্চ মেজর জিয়া স্বকণ্ঠে ঘোষণা দেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার— ওই বেতার কেন্দ্র থেকেই। আমি সেটা শুনিনি, অনেকেই শুনেছিলেন। ২৮ মার্চে জিয়াউর রহমান সংশোধিত ঘোষণা পাঠ করেন বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। তাঁর সঙ্গে ১০ এপ্রিলে রামগড়ে আমার দেখা হয়। আমি যখন বলি যে, বেতারে তাঁর ঘোষণা শুনেছি, তিনি জানতে চান, কোনটা? আমি বলি যেটায় আপনি বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

মেজর জিয়ার ঘোষণা আমাদের অনেক শক্তি ও সাহস জুগিয়েছিল। এ ঘোষণার ঐতিহাসিক গুরুত্ব লঘু করে দেখা উচিত নয়। কিন্তু জিয়ার অনুরাগীরা বঙ্গবন্ধুর ঘোষণার কথা অস্বীকার করতে চান। বঙ্গবন্ধু নিজে ঘোষণা লিখে গিয়েছিলেন, না তাঁর নামে ঐ ঘোষণা প্রচার করা হয়েছিল— এ সম্পর্কে আলোচনা-গবেষণা চলতে পারে। কিন্তু ঘোষণা যে প্রচারিত হয়েছিল এবং জিয়াউর রহমানের ঘোষণার আগেই, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

বঙ্গবন্ধুর নামে ওই ঘোষণা প্রচারিত না হলেও তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্থপতি হয়ে থাকতেন। পয়লা থেকে পঁচিশে মার্চ আমরা কার কথায় চলেছিলাম? ৭ মার্চে কি তিনি স্বাধীনতার পরোক্ষ ঘোষণা করেননি? যাঁরা তখনো তাঁর দোষ খুঁজে বেড়াতেন, তাঁরা বলতেন, শেখ মুজিব কেন স্বাধীনতা ঘোষণা করতে দেরি করেছেন? কোনো সামরিক কর্মকর্তা দূরে থাক, আর কোনো রাজনীতিবিদকে দিয়েও ওই কাজটি হতো না। তারপর শুধু ১৯৭১ কেন? একাত্তরের পেছনের চব্বিশ বছরের ইতিহাসই তো অনিবার্য করে তুলেছিল মুক্তিযুদ্ধকে।

মুক্তিযুদ্ধে সামরিক বাহিনীর এবং পুলিশ, বিডিআরের (তখন ইপিআর) ভূমিকা ছোট করা ঠিক নয়। কিন্তু সামরিক কর্মকর্তারা প্রায় সকলেই রাজনীতিবিদবিরোধী এবং ভারতবিরোধী ছিলেন। এ তাঁদের বিশেষ ধরনের প্রশিক্ষণের ফল। খালেদ মোশাররফ

ভারত-সমর্থক হওয়ার পরিচিতি নিয়ে প্রাণ দিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় আগরতলায়, ২৬ এপ্রিলে। তাঁর মুখে প্রথম যে বাক্যটি শুনি তা ভারতের বিরুদ্ধে। রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে এক ধরনের অশ্রদ্ধাবোধ এঁদের অধিকাংশের মজ্জাগত ছিল। আওয়ামী লীগবিরোধী রাজনীতিবিদেরাও তাতে ইন্ধন জুগিয়েছিল। ফলে এমন এক ধরনের কথা রটে গেল যে, মুজিবনগর সরকার কলকাতায় বসে দিব্যি নিশ্চিন্তে কাল কাটাচ্ছেন আর সেনাবাহিনী এবং তাঁদের নেতৃত্বে বেসামরিক মুক্তিযোদ্ধারা দেশ স্বাধীন করার জন্য যুদ্ধ করছেন। যুদ্ধের রাজনৈতিক নেতৃত্ব তাঁরা বাধ্য হয়ে মেনে নিয়েছেন ভারত সরকারের চাপে, নইলে ভারতের মাটি থেকে যুদ্ধ করা যায় না।

দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস ও রাজনীতি থেকে মুক্তিযুদ্ধকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টাই আসলে পরিলক্ষিত হয় বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাকে অস্বীকার করে মেজর জিয়াকে স্বাধীনতার ঘোষক বলে অভিহিত করার মধ্যে। জিয়ার জীবদ্দশায় তাঁকে স্বাধীনতার ঘোষক বলা হলেও বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা-ঘোষণাকে অস্বীকার করার চেষ্টা হয়নি। তার একটা প্রমাণ পাওয়া যাবে *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ— দলিলপত্র* গ্রন্থে। কিন্তু তারপরে সামরিক কর্তৃত্বকে বড় করে তোলার উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধুকে ছোট করার চেষ্টা দেখা দেয়।

এখন আবার জিয়াউর রহমানের আদর্শের কোনো কোনো সৈনিকের মুখে অন্য কথা শুনছি। ভারত থেকে (এক কোটি?) লোক এসে ভোট দিয়ে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে জিতিয়েছিল এবং তাদের চক্রান্তে পাকিস্তান দু-টুকরো হয়ে গেল। ১৯৭০ সালে পেয়ারা পাকিস্তানের পেয়ারা সেনাবাহিনী কি করছিল? এদের ঠেকায়নি কেন? আর মেজর জিয়াই বা কেন এই চক্রান্তে জড়িয়ে পড়লেন? কী দরকার ছিল তাঁর স্বাধীনতা-ঘোষণার?

এসব কথা পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়, আলোচনার অযোগ্য বলে স্থির করা যায়, কিন্তু এই পাগলামির যে একটা রীতি আছে— ইংরেজিতে যাকে বলে মেথড ইন ম্যাডনেস— তা অগ্রাহ্য করা ঠিক হবে না। মূল ঝোঁকটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধকে অস্বীকার করা, তার চেতনাকে ভূলুণ্ঠিত করা, একটি জাতির আত্মবিকাশের পথ রুদ্ধ করা।

মুক্তিযুদ্ধের কথাটা স্মরণ করা এই জন্যই জরুরি। আমরা ইতিহাসের বন্দি— প্রিজনারস অব হিস্ট্রি— হয়ে বর্তমানে বাস করতে চাই না। কিন্তু আমাদের অস্তিত্বের মূল নিয়ে যখন টান দেওয়া হয়, তখন ইতিহাস আঁকড়ে ধরা ছাড়া মুক্তির পথ থাকে না। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কী করেছিল, আজ তা ভুলে যেতে হবে, কেননা তারা আমাদের ভাই। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, বুদ্ধিজীবী হত্যা করেছিল, তাদের সে অপরাধ ক্ষমা করে দিতে হবে— তা না হলে জাতি বিভক্ত হয়ে যাবে। দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার একটাই পথ— ভারতবিরোধিতা। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তাদের সাহায্য-সহযোগিতার কথাও স্মরণ করা

যাবে না— কেননা তারা তা করেছিল নিজেদের স্বার্থে। সোভিয়েত ইউনিয়ন কী করেছিল তখন— তা আর মনে রাখার দরকার নেই— কেননা সোভিয়েত ইউনিয়নই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। চীন যা করেছিল, ঠিকই করেছিল— কেননা তারা ভারতীয় সম্প্রসারণবাদকে ঠিক চিনেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যদি আমাদের বিরোধিতা করেও থাকে তা অতীতের ব্যাপার— এখন তো তাদের সাহায্যই ভরসা। আর আরব দেশগুলো— যখনই যাই করুক না কেন, ওরা তো আমাদের বড় ভাই— দেখো, কত লোককে চাকরি দিচ্ছে। আর পেয়ারা পাকিস্তান না ভাঙলে আমরা কত ভালো থাকতাম।

অনেকে পরামর্শ দেন, পেছন ফিরে না তাকিয়ে শুধু সামনের দিকে তাকাতে, উন্নয়নের জন্য কাজ করতে, জাতীয় ঐক্য বা অন্তত মতৈক্য গড়ে তুলতে। কিন্তু কি করে হবে সেই ঐক্য যদি তার ভিত্তি রচিত না হয়? বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটির উদ্ভবই ১৯৭১ সালে। কিভাবে আর কেন উদ্ভব হলো, এ রাষ্ট্রের নাগরিকদের স্বাতন্ত্র্যের দাবির যৌক্তিকতা কী, তা না বুঝে না জেনে আমরা কতদূর অগ্রসর হতে পারব? যারা সেদিনের ইতিহাসই বদলে দিতে চায়, তাদের সঙ্গে এক হবো কি করে! এক হওয়া জরুরি নানা কারণেই, কিন্তু কাদের নিয়ে একতা, কাদের জন্যে একতা, সেকথাও জিজ্ঞেস করতে হবে নিজেদের।

রাষ্ট্রধর্ম করে দেশের মানুষকে বিভক্ত করা হয়েছে— যে-সমস্যা ছিল না, তা নিয়ে আসা হয়েছে। দারিদ্র্য তো দেশের মানুষকে বিভক্ত করেই রেখেছে। এসব বিভেদ ঘুচিয়ে আমরা দেশবাসীর সুখী ভবিষ্যৎ নিশ্চয় গড়তে চাই—কিন্তু সে-ভবিষ্যতের ভিত্তি যে ১৯৭১ সালে রচিত হয়েছিল, সেকথা মানতে হবে, জানতে হবে।

সকলের এবং কতিপয়ের

বাংলাদেশের ইতিহাসের এ এক নির্মম পরিণতি যে, যা-কিছু একদিন দেশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল, তার সবকিছুই আজ তাদেরকে বিভক্ত করেছে।

১৯৬৯ থেকে ৭১-এর সময়ের কথা ভাবুন। তখন গগনবিদারী ধ্বনি ছিল ঃ জয় বাংলা। কে এ ধ্বনি দিল, কেন দিল, বাংলা বলতে কী বোঝায়— এসব প্রশ্ন সেদিন ওঠে নি। মানুষ জেনে গেল, জয় বাংলা মানেই পূর্ব বাংলার হিতকামনা, ওই পথেই মুক্তি, যার মুখে জয় বাংলা সেই বন্ধু। ১৯৭১-এ পাকিস্তানী সেনাকবলিত দেশে যখন আর এ-ধ্বনি উচ্চারণ করা যেতো না, তখনও মানুষ মনে মনে আউড়েছে এ বুলি, গোপনে স্বাধীন বাংলা বেতারে এ ধ্বনি শুনে আশ্বস্ত হয়েছে। রণাঙ্গনে তো এটাই ছিল রণধ্বনি, শরণার্থী-শিবিরে সকল দুর্দশার মধ্যেও চরম প্রত্যয়ের অভিব্যক্তি। ১৬ ডিসেম্বরে যে-স্বাধীনতা পাওয়া গেল, তা অনেক কিছুর সঙ্গে এই জয় বাংলা বলারও স্বাধীনতা।

এখন রাষ্ট্রীয়ভাবে এ-ধ্বনি নির্বাসিত। এটি হয়ে পড়েছে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের ধ্বনি। এ-ধ্বনি তুললে এখন আর সকলে সাড়া দেবে না।

আর তার বদলে যে-ধ্বনি এসেছে, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, কী করে ভোলা যায় যে, তার সূত্রপাত বঙ্গবন্ধুর মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়ে? মনে হয়, এ-ধ্বনিতে লেগে আছে বালবনিতার রক্ত। সকলে এতে গলা মেলাতে পারবে না।

বঙ্গবন্ধুর কথাই ভাবি না কেন। ১৯৬৯ সালে এমন কোনো দেশপ্রেমিক ছিল যে তাঁর জীবনের জন্যে উৎকণ্ঠিত হয়নি, তাঁর মুক্তি চায় নি? তারা সবাই যে তাঁর রাজনৈতিক দলের অনুসারী ছিল, তা নয়; সকলে এক মতাদর্শের ছিল না। উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের সূচনা করেছিল যে-সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ, তাদের মধ্যেও ছিল নানা মত, কিন্তু একটি বিষয়ে তাদের মতৈক্য ছিল, পাকিস্তানীদের হাতে শেখ মুজিবকে আর এভাবে নির্যাতিত হতে দেওয়া যায় না। তারা তাঁর অনুসারী না হয়েও তাঁকে আপন জেনেছিল, বাঙালির বন্ধু বলে মেনেছিল।

আজ তাঁকেও দেশের নয়, দলের বলে দেখা হচ্ছে।

তেমনি ১৯৫২ সাল থেকে আমাদের সংগ্রাম বাঙালি হবার। ১৯৭১-এ বাঙালি মানেই পাকিস্তানিদের চোখে অপরাধী। ১৯৭২-এ সেই বাঙালি হবার গৌরব অর্জন করি আমরা। অর্জনের পর বিসর্জন। এখন কেউ কেউ বলছেন, আমরা বাঙালি নই, বাঙালি হতে চাই না।

এই-যে একে একে মিলনের ভিত্তিভূমি আমরা বিনষ্ট করে ফেললাম, এর পরিণাম কী?

পরিণামের কথা মুলতবি রেখে অনেকে যে-প্রশ্নের মীমাংসা করতে চাইবেন, তা হলো, কেন এমন হলো? মুজিব কি ভুল করেননি, প্রশ্রয় দেননি অন্যায়কে? হ্যাঁ, ভুল

করেছেন তিনি, অন্যায়ও ঘটেছে তাঁর শাসনকালে। কিন্তু তা কি মুছে দিতে পারে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা, জাতির জন্যে তাঁর আত্মত্যাগ? তিনি উত্তম বাঙালি ছিলেন, কিন্তু তিনি একাই তো বাঙালি ছিলেন না? জয় বাংলা তিনি বলেছিলেন, যেমন বাংলাদেশ তিনি চেয়েছিলেন। আজ জয় বাংলা বলতে যাঁরা দ্বিধা করেন, কাল তাঁরা দেশের নাম বলতে যে কুণ্ঠিত হবেন না, তার নিশ্চয়তা কী?

তাই কারণের নামে খোঁড়া যুক্তি খুঁজে লাভ নেই। বঙ্গবন্ধু যে-সংবিধান প্রণয়ন করেছিলেন, তা সংশোধন করে তিনি যদি ভুল করে থাকেন, তাহলে যাঁরা এর খোল-নলচে পালটে দিলেন, তাঁদের সম্পর্কে কী হবে আমাদের বিচার? যাঁরা অসাংবিধানিক উপায়ে দেশের ভাগ্যবিধাতা বনে গেলেন, তাঁদের সম্পর্কে কী হবে ইতিহাসের রায়?

সেজন্যে বর্তমান অবস্থার কথা বলি, পরিণামের কথা বলি। আমাদের মিলনক্ষেত্র নষ্ট হয়ে গেছে, মানুষ নানা ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। এখন যখন মিলনের কথা ওঠে, ঐক্যের কথা ওঠে, তখন কেউ কেউ আবার মুক্তিযুদ্ধবিরোধীদের নিয়ে ঐক্য গড়ার কথা বলেন। এটা অসম্ভব ব্যাপার, কেননা তারা যে শুধু ১৯৭১-এ পাকিস্তানী বাহিনীর সকল অপকর্মের সহযোগী ছিল, তা-ই নয়, আজও তারা বাংলাদেশের আদর্শগত ভিত্তিকে আঘাত হানার কোনো সুযোগ ছাড়ে না। যারা বাংলাদেশ চায় নি– পাকিস্তান থেকে ভৌগোলিক ও আদর্শিকভাবে ভিন্ন একটি রাষ্ট্র চায় না, জাতীয় ঐক্যের নামেও তাদের সঙ্গে মিল হয় না।

কিন্তু বাংলাদেশের আদর্শিক ভিত্তি সম্পর্কে কি আমরা সজাগ? এখানেই গোলমাল। সেই ভিত্তিতে আস্থা না থাকলে বৃথাই মিলনক্ষেত্র খোঁজা।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পাঁচ বছরের মধ্যেই, পূর্ব বাংলায় অন্তত, পাকিস্তানের আদর্শ সম্পর্কে আমরা আস্থা হারিয়েছিলাম। সে আরেক প্রসঙ্গ। বাংলাদেশের আদর্শ সম্পর্কে তেমনি যদি গরিষ্ঠ মানুষ আদর্শ হারায়, তাহলে মাটি থাকবে, বাংলাদেশ থাকবে না। যদি বাংলাদেশ রাখতে হয়, তাহলে ইতিহাস জানতে হবে, বুঝতে হবে। কেন আমরা বাংলাদেশ চেয়েছিলাম, কিসের ভিত্তিতে চেয়েছিলাম, তা বুঝতে হবে। তখন দেখা যাবে, আজ যা দলীয় বলে মনে হয়, তা সকলের। দেশটা যেমন।

মিলনের ক্ষেত্র চাই। ১৯৫২-এ আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলাম, ১৯৬৯-এ, ১৯৭১-এ। তাতেই সম্ভবপর হয়েছিল আমাদের অর্জন। যদি অগ্রসর হতে হয়, তাহলে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। ঐক্যবদ্ধ হতে হলে প্রশস্ত ক্ষেত্র খুঁজে পেতে হবে। তৈরি ক্ষেত্রগুলো তো নষ্ট করেছি। আবার ক্ষেত্র রচনা করতে হবে, ফিরে পেতে হবে।

বাংলাদেশে ধর্ম, রাজনীতি ও রাষ্ট্র

উনিশ শতকের বঙ্গদেশে ধর্মসংস্কার-আন্দোলনের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এর একটা ধারা প্রবাহিত হয়েছিল রামমোহন রায় থেকে কেশবচন্দ্র সেন পর্যন্ত। এর পাশাপাশি চলেছিল রাধাকান্ত দেব থেকে রামকৃষ্ণ পরমহংস-স্বামী বিবেকানন্দ অবধি একটি ধারা— তার লক্ষ্য সমাজসংস্কার ছিল না, ছিল ধর্মীয় ভাবাবেগসৃষ্টি ও ঐতিহ্যপ্রীতির প্রকাশ ঘটানো। অন্য একটি ধারায় দেখি সৈয়দ আহমদ বেরিলভি-প্রবর্তিত তথাকথিত ওয়াহাবি আন্দোলন, তিতুমীর-পরিচালিত সংগ্রাম এবং হাজি শরিয়তউল্লাহ্‌র নেতৃত্বাধীন ফারায়েজি আন্দোলন। এসব আন্দোলনই সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। ধর্ম ও রাজনীতির এই মিলন নানা রূপ ধারণ করেছিল, তার ফলও হয়েছিল বহুমুখী। তবে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতার মতো কিছু কিছু ইতিবাচক দিক থাকা সত্ত্বেও তা কিন্তু দেশের মানুষকে ক্রমাগত বিভক্ত করতে সাহায্য করেছিল।

ধর্ম ও রাজনীতির সংযোগের একটা রূপ দেখা দিয়েছিল খিলাফত আন্দোলনে— সে-আন্দোলনে হিন্দুরাও যোগ দিয়েছিলেন। বঙ্গভঙ্গের পরে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে যে-সহিংস সংগ্রাম দেখা দিয়েছিল, তার ইডিয়ম ছিল অনেকখানি ধর্মভিত্তিক— এর ভাবগত ভিত্তি গড়ে উঠেছিল গীতাকে কেন্দ্র করে। গান্ধীর ভাষায়ও ধর্মের প্রভাব দেখি। যদিও তিনি সব সম্প্রদায়ের মানুষের ঐক্য কামনা করেছিলেন, কিন্তু আদর্শ রাষ্ট্র তাঁর ভাষায় ছিল রামরাজ্য। গান্ধী খিলাফত সমর্থন করেছিলেন, সৈয়দ আহমদ খান করেননি। সৈয়দ আহমদ খান ভারতীয় মুসলমানদের বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, কুরআন ও হাদিসে কোনো আন্তর্জাতিক খলিফার কথা বলা হয়নি; ইসলামের ইতিহাসে একই সময়ে তিন খিলাফত ছিল— বাগদাদে আব্বাসীয়দের, মিশরে ফাতেমিদের এবং স্পেনে উমাইয়াদের; ব্রিটিশ ভারতের মুসলমানদের পক্ষে তুরস্কের সুলতানদের প্রতি আনুগত্য স্বীকারের কোনো হেতু নেই এবং তাঁকে খলিফাও বলা যায় না। সৈয়দ আমহদ খান ভারতীয় মুসলমানের স্বতন্ত্র স্বার্থের ওপর জোর দিয়েছিলেন, এ কথা আমরা জানি; কিন্তু যেকথা আমরা বিস্মৃত হয়েছি, তা এই যে, ধর্মনির্বিশেষে এ দেশের সকল মানুষকে তিনি এক জাতিভুক্ত বলে বিবেচনা করেছিলেন, ধর্মীয় পার্থক্যের চেয়ে এক দেশে বসবাস করাকে তিনি এক সময়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছিলেন, হিন্দুস্থানের অধিবাসীমাত্রকে তিনি ওই অর্থে হিন্দু বলার পক্ষে ছিলেন এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির খাতিরে তিনি গোহত্যা-নিবারণে প্রস্তুত ছিলেন। এসব ক্ষেত্রে স্বধর্ম ও স্বদেশের মধ্যে যে পার্থক্য তিনি করেছিলেন, তা তাৎপর্যপূর্ণ। ধর্ম সম্পর্কে তাঁর আরেকটি মৌলিক ধারণার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক আছে কিনা, তাও ভেবে দেখা যেতে পারে। তিনি মনে করতেন যে, সকল নবিই মানবসমাজের অভিন্ন ধর্মবিশ্বাস (*দীন*) প্রচার করেছিলেন, কিন্ত তাঁরা প্রত্যেকেই নিজেদের কালোপযোগী ভিন্ন ভিন্ন জীবনবিধান (*শরিয়া*) বয়ে নিয়ে এসেছিলেন। বিশ্বাস শাশ্বত বা অপরিবর্তনীয় কিন্তু বিধান পরিবর্তনীয় ও ইহজাগতিক। পূর্বগামী নবিদের আনীত বহু আইন কুরআন শরিফ বাতিল করে দিয়েছে, কেননা ইতিহাসের অগ্রগতির পরিপ্রেক্ষিতে সেসব আইনের

প্রয়োগযোগ্যতা হারিয়ে গিয়েছিল। ইহজাগতিক ও পারলৌকিককে তিনি যে এভাবে আলাদা করে দেখতে পেরেছিলেন, তা ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, সৈয়দ আহমদ খানের মতে, আধুনিক পাশ্চাত্ত্য দেশগুলোর সাফল্যের একটি মূল কারণ এই যে, তারা ধর্মীয় আইন ও রাষ্ট্রীয় আইনকে পৃথক করতে সমর্থ হয়েছে।

অন্যপক্ষে মোহাম্মদ আলি ও আবুল কালাম আজাদ— এই দুই মওলানাই খিলাফত আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। তাঁরা উভয়েই খলিফারূপে তুর্কি সুলতানের দাবির পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছিলেন এবং নিখিল ভারত খিলাফত সম্মেলনে মোহাম্মদ আলি এই মর্মে প্রস্তাব পাশ করিয়েছিলেন যে, ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে কর্মগ্রহণ মুসলমানের পক্ষে হারাম। ইসলামের ঐক্য ও মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যের বিষয়ে মোহাম্মদ আলির বেশ কিছু বক্তব্য আছে। তবে ধর্মীয় অস্তিত্ব ও দেশগত পরিচয়কে তিনিও পৃথক করে দেখতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি ভারতবর্ষের জন্যে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পক্ষপাতী ছিলেন: সে-যুক্তরাষ্ট্র কেবল রাজনৈতিক নয়, ধর্মীয় যুক্তরাষ্ট্রও। প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে তিনি বলেছিলেন যে, আল্লাহ্‌র আদেশ যখন আসে, তখন তিনি মুসলমান এবং মুসলমান ছাড়া কিছু নন; কিন্তু যখন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও কল্যাণের প্রশ্ন আসে, তখন তিনি ভারতীয় এবং ভারতীয় ছাড়া কিছু নন। মুসলিম জগৎ ও ভারতবর্ষকে তিনি তুলনা করেছিলেন অসমকেন্দ্রিক দুই বৃত্তের সঙ্গে, যার একটির অনেকখানি অধিকার আছে অপরের ক্ষেত্র। দুই বৃত্তের মধ্যেই তাঁর স্থান আছে এবং তিনি কোনোটিই ত্যাগ করতে পারেন না। হিন্দু ও মুসলমানের উপাস্য যে আলাদা, তাতে কিছু আসে যায় না, এ কথাও তিনি বলেছিলেন।

প্রথম জীবনে আবুল কালাম আজাদ ইসলামের বাইরে কিছু ভাবতে চাননি। তাই এক সময়ে ধর্ম ও রাজনীতিকে পৃথক করা তিনি মুসলমানের পক্ষে নীরব ধর্মদ্রোহিতার তুল্য জ্ঞান করেছিলেন। ১৯১২ সালে তিনি স্পষ্টই লিখেছিলেন যে, 'জাতি' শব্দ ইউরোপে সহস্র হৃদয়ে স্পন্দন তোলে, আর মুসলমানের হৃদয় স্পন্দিত হয় 'আল্লাহ্‌' বা 'ইসলাম' শব্দে। খিলাফত আন্দোলনের সময়ে তিনি খিলাফতের একটি নতুন তত্ত্ব উপস্থাপিত করেন এবং ভারতবর্ষে ইংরেজ-শাসনের বিরুদ্ধে হিন্দুর সঙ্গে সহযোগিতা করা মুসলমানের কর্তব্য বলে স্থির করেন। পরে অসহযোগ আন্দোলনের কালে তিনি যে-তত্ত্বে উপনীত হন, তাতে আজীবন নিষ্ঠ ছিলেন। এই তত্ত্বের মূল তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন হজরত মুহম্মদের মদিনা-চুক্তিতে, যাতে মুসলমান-অমুসলমান-নির্বিশেষে মদিনাবাসীকে *উম্মা ওয়াহিদা* বা একটিমাত্র সম্প্রদায় বলে অভিহিত করা হয়। এটিকে নজির হিসেবে ধরে নিয়ে তিনি ভারতের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন এবং এভাবে ইসলামের সর্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধের পাশাপাশি ভারতবাসীর অখণ্ড সত্তায় আস্থাজ্ঞাপন করেছিলেন।

এক্ষেত্রে ইকবালের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল একেবারেই ভিন্ন। তিনি মনে করতেন, 'আমাদের জাতীয়তা'র ভিত্তি দেশ বা ভাষার ঐক্য নয়, বিশ্ববীক্ষার বিশিষ্টতা, ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার, এবং বিশেষ সমাজব্যবস্থাই এর মূলনীতি। ইসলামে ধর্ম ও রাজনীতিকে পৃথক করা যায় না, এই দৃঢ় ধারণার বশবর্তী ছিলেন তিনি। তাঁর মতে,

মুসলমানের পক্ষে তাই ইসলামি সংহতির ধারণার পরিবর্তে জাতীয়তার ভিত্তিতে *পলিটি* বা রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভবপর নয়। অবশ্য তিনি এ-কথা স্বীকার করেছিলেন যে, ইসলামি দুনিয়ায় জাতীয়তার ধারণা শেষ পর্যন্ত কী পরিণতি লাভ করবে, তা তিনি বলতে পারেন না। ভিন্ন ধরনের অনেক ধ্যান-ধারণা ইসলাম আত্মস্থ করেছে, রূপান্তরিতও করেছে; তেমনি করে জাতীয়তার ভাব ইসলাম আত্মস্থ ও রূপান্তরিত করবে, কিংবা এই ভাবের জোরে নিজের কাঠামোর বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করবে, সে-সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা তিনি কঠিন বলে মনে করেছিলেন। আবার ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যে-স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রগঠনের স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন, সেখানে ধর্মীয় শাসন প্রচলিত হবে না বলেই মনে করেছিলেন।

জাতিতত্ত্ব সম্পর্কে ইকবালের বক্তব্য খণ্ডন করে তাঁকে পত্র লিখেছিলেন হুসেন আহমদ মদনি— জমিয়তুল উলামায়ে হিন্দের সভাপতি। তিনি বলেছিলেন *কওম* ও *মিল্লাত* এক নয় : রেস বা নৃজাতি, ধর্ম, বর্ণ, পেশা কিংবা বসতি-ভিত্তিক যে-কোনো জনগোষ্ঠী হলো *কওম*; আর *মিল্লাত* হলো একই *শরিয়া* বা *দীন*-ভুক্ত জনসমাজ। ধর্মে ভিন্ন হলেও অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে মুসলমানেরা একই জাতীয়তার অংশীদার। তাঁর মতে, জাতি এখন দেশভিত্তিক।

ধর্মীয় অনুশাসন নিয়ে জিন্নাহ্ একেবারেই ভাবিত হননি। তাঁর জীবনীকার বলছেন যে, ইসলামে নিষিদ্ধ ভক্ষ্য ও পানীয়ে তাঁর বিরাগ ছিল না। তাঁর রাজনৈতিক বিরোধীদের অনেকেই তাঁকে চিহ্নিত করেছিলেন ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ ও উদাসীন বলে। জিন্নাহ্ ধর্ম নিয়ে কথা বলেননি, বলেছিলেন সম্প্রদায় নিয়ে। ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থ-সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে তাঁর মনে হয়েছিল যে সমাজ, অঞ্চল ও ভাষার ভিত্তিতে বিভক্ত এই সম্প্রদায়কে আপন ইষ্টসাধনের জন্যে ঐক্যবদ্ধ করতে হলে ধর্মের প্রভাবকে কাজে লাগাতে হবে। তিনি দাবি করলেন যে, যে-কোনো মানদণ্ডে মুসলমানেরা এক জাতি এবং তাদের আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের পূর্ণতম বিকাশ ঘটাতে হলে প্রয়োজন নিজস্ব এলাকা, বাসভূমি ও রাষ্ট্রের। তবু জিন্নাহ্ কখনো বলেননি যে, পাকিস্তান হবে ইসলামি রাষ্ট্র, বরঞ্চ এ-কথাই বলেছিলেন যে, ভাবী রাষ্ট্রের রূপ নির্ভর করবে জনপ্রতিনিধিদের অভিপ্রায়ের উপরে। নিজের থেকে তিনি পাকিস্তানকে কল্পনা করেছিলেন আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে। তাই মওলানা মদনি জিন্নাহ্কে উদ্‌ধৃত করে বলেছিলেন যে, পাকিস্তান যে ধর্মীয় রাষ্ট্র হবে না, জাগতিক রাষ্ট্র হবে, তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে। জিন্নাহ্কে তিনি অভিহিত করেছিলেন 'কাফেরে আজম' বলে এবং মুসলিম লীগে যোগদান ইসলাম-বিরোধী কাজ বলে ফতোয়া দিয়েছিলেন। জামায়াতে ইসলামীর প্রধান সৈয়দ আবুল আলা মওদুদী পাকিস্তানের নাম দিয়েছিলেন 'নাপাকিস্তান', কারণ তাঁর ধারণা ছিল, প্রতিষ্ঠিত হলে ওটি হবে *কাফেরানা* রাষ্ট্র। জাতীয়তাবাদ— তা ভারতীয় মুসলিম জাতীয়তাবাদ হলেও— এবং গণতন্ত্রের ধারণা পাশ্চাত্ত্যসংস্কৃতিজাত বলে গণ্য করে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। মুসলিম জাতীয়তাবাদকে তিনি সতীসাধ্বী বারাঙ্গনার মতো স্ববিরোধী জিনিস বলে অভিহিত করেছিলেন। সেইসঙ্গে স্পষ্ট করে বলেছিলেন যে, জিন্নাহ্ থেকে শুরু করে মুসলিম লীগের নিম্নপর্যায়ের কর্মীদের কারো দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলামসম্মত নয় এবং কোনো সমস্যাকে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার ক্ষমতা তাঁদের নেই।

জিন্নাহ্ যে সে-চেষ্টা করেছিলেন, তা বলা যাবে না। বরঞ্চ ভারতীয় মুসলমানেরা যে আলাদা জাতি, এ কথা নিজেই তিনি দুবার খণ্ডন করেছিলেন ১৯৪৭ সালে। মাউন্টব্যাটেন যখন তাঁকে জানান যে, ভারত-বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে পাঞ্জাব ও বঙ্গদেশের বিভাগও অনিবার্য, তখন তিনি চমকে উঠে বলেছিলেন যে, তা কী করে হবে, এসব প্রদেশের প্রত্যেকটির ভাষা ও সংস্কৃতি এক এবং এর অধিবাসীরা একই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী। ভাইসরয় উত্তর দিয়েছিলেন যে, এসব কথা, এক অর্থে, সমগ্র ভারতবর্ষ সম্পর্কেও প্রযোজ্য। জিন্নাহ্ চুপ করে গিয়েছিলেন। তবে পাকিস্তান গণপরিষদের উদ্বোধন করতে গিয়ে তিনি একাধিকবার বলেছিলেন যে, ধর্ম ব্যক্তির নিজস্ব ব্যাপার, তার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় কাজকর্মের কোনো যোগ নেই। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, এই মূলনীতি নিয়ে পাকিস্তানের সূচনা হতে যাচ্ছে যে, ধর্মবর্ণমত-নির্বিশেষে সকলে রাষ্ট্রের সমান নাগরিক, এবং আশা করেছিলেন যে, কালে— ধর্মীয় অর্থে নয়, রাজনৈতিক অর্থে— হিন্দু আর হিন্দু থাকবে না, মুসলমানও মুসলমান থাকবে না।

ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত *আত্মকথায়* লিখেছেন যে, জিন্নাহ্‌র এই কথায় আস্থা স্থাপন করে তিনি পাকিস্তানে থেকে যাবার সংকল্প গ্রহণ করেন এবং এই বক্তব্য কার্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালের শেষদিকে প্রাদেশিক হিন্দু-সম্মেলন আহ্বান করে পাকিস্তানে যুক্ত নির্বাচন প্রথার দাবি জানিয়ে প্রস্তাব পাশ করেন।

দুই

গণপরিষদের উদ্‌বধনী ভাষণে জিন্নাহ্ যা বলেছিলেন, সে-সম্পর্কে তিনি নিজে কতখানি নির্দ্বন্দ্ব ছিলেন, তা বলা কঠিন। ১৯৪৭ সালের ১৫ ডিসেম্বরে করাচিতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সর্বশেষে কাউন্সিল-অধিবেশনে সভাপতিরূপে তিনি বলেছিলেন : 'এ কথা স্পষ্ট হওয়া দরকার যে, পাকিস্তান হতে যাচ্ছে ইসলামি আদর্শভিত্তিক একটি মুসলিম রাষ্ট্র। এটি ধর্মীয় রাষ্ট্র হতে যাচ্ছে না। ইসলামে নাগরিকতার ক্ষেত্রে কোনো ভেদাভেদ নেই।' এই বক্তব্যের অন্তর্নিহিত বিরোধ অন্তত খুব স্পষ্ট। ওই অধিবেশনে প্রস্তাব করা হয়েছিল যে, এখন নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ভেঙে পাকিস্তান মুসলিম লীগ ও ভারতীয় ইউনিয়ন মুসলিম লীগ গঠিত হোক। এর বিরোধিতা করে শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী বলেছিলেন যে, পাকিস্তান যেহেতু অর্জিত হয়ে গেছে, সেহেতু সংগঠনের এমন পুনর্বিন্যাস করা উচিত যাতে সংখ্যালঘুরাও জাতীয় ভিত্তিতে গঠিত দলে যোগদানের সুযোগ পায়। তার উত্তরে কয়েক জন বড় বড় নেতা বলেছিলেন যে, এর মানে মুসলিম লীগকে শেষ করে দেওয়া, মুসলিম লীগ থাকলে তবেই ইসলাম থাকবে, মুসলমান থাকবে। বিপুল ভোটাধিক্যে মূল প্রস্তাব পাশ হয়েছিল; সোহ্‌রাওয়ার্দী, মিয়া ইফতিখারউদ্দীন ও হুসেন ইমামের মতো মাত্র দশজন সদস্য বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিলেন। জিন্নাহ্‌র সহানুভূতি যে এঁদের বক্তব্যের দিকে ছিল না, অধিবেশনের বিবরণ পড়লে তা বেশ বোঝা যায়।

জিন্নাহ্ যাই বলুন না কেন, এটা নিঃসন্দেহ যে, তাঁর সহকর্মী ও উত্তরাধিকারীরা পাকিস্তানকে আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্ররূপে গড়ে তুলতে চাননি এবং রাজনৈতিকভাবে

মুসলমান-অমুসলমানের ভেদও ঘুচিয়ে দিতে চাননি। ১৯৪৮ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারিতে গণপরিষদের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে বাংলা ব্যবহারের প্রস্তাব করে এবং প্রসঙ্গক্রমে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে বাংলার দাবির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত যে-বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তার জবাবে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান বলেছিলেন, 'পাকিস্তান একটি মুসলিম রাষ্ট্র এবং এর সাধারণ ভাষা হবে মুসলিম জাতির ভাষা।' দৈনিক *আজাদ* তখন লিখেছিলেন যে, যেখানে জিন্নাহ্ বারবার পাকিস্তানকে 'সেক্যুলার রাষ্ট্র' বলে ঘোষণা করেছেন, সেখানে লিয়াকত আলি দেশকে 'মুসলিম রাষ্ট্র' বললেও তা গুরুত্বের সঙ্গে নেওয়া যায় না। কিন্তু এ কথা তো সত্যি যে, লিয়াকত আলির বক্তৃতার সময়ে জিন্নাহ্ স্বয়ং অধিবেশনে সভাপতিত্ব করছিলেন এবং প্রধানমন্ত্রীকে সংশোধন করার কোনো চেষ্টাই তিনি করেননি।

জিন্নাহ্র মৃত্যুর পর লিয়াকত আলি ও তাঁর ক্ষমতাসীন সহকর্মীরা ধীরে ধীরে পাকিস্তানকে ইসলামি রাষ্ট্র করে তোলার পথে অগ্রসর হয়েছিলেন। পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্যে ধর্মীয় বন্ধন ছাড়া আর কিছু তাঁরা খুঁজে পাননি; যে-ধরনের নীতি তাঁরা অবলম্বন করছিলেন, তাতে রাষ্ট্রের বৈধতার জন্যে দরকার হয়েছিল ইসলামের। ১৯৪৯ সালে গণপরিষদে প্রধানমন্ত্রী যে *অবজেকটিভ রেজোলিউশন* উত্থাপন করেছিলেন তার প্রথমেই— শুধু পাকিস্তান রাষ্ট্রের নয় সমগ্র বিশ্বচরাচরের— সার্বভৌমত্ব আল্লাহ্র বলে অভিহিত করা হয় এবং যদিও তখনো পাকিস্তানকে ইসলামি রাষ্ট্র না বলে স্বাধীন ও সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্র বলে আখ্যা দেওয়া হচ্ছিল, তবু সকল মুসলিম নাগরিক যাতে কুরআন ও সুন্নায় বর্ণিত ইসলামের শিক্ষা ও আবশ্যকতা-অনুযায়ী ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন গঠন করতে পারে, তার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। ১৯৫০ সালে মূলনীতি কমিটির রিপোর্টে এর প্রতিধ্বনি করা হয় এবং সেই সঙ্গে যোগ করা হয় যে, রাষ্ট্রপ্রধান হবেন একজন মুসলমান। ১৯৫৬ সালে গৃহীত পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্রে দেশকে 'ইসলামি প্রজাতন্ত্র' ঘোষণা করা হয়। ১৯৬২ সালে প্রবর্তিত দ্বিতীয় শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রের নাম হয় পাকিস্তান প্রজাতন্ত্র— অর্থাৎ 'ইসলামি' কথাটা সচেতনভাবে বাদ দেওয়া হয়— কিন্তু আগের শাসনতন্ত্রের 'ইসলামি' বিধিবিধান তাতে অনেকখানি অক্ষুণ্ন থাকে এবং তার সঙ্গে আরো কিছু ইসলামি বিধানের ব্যবস্থা যুক্ত হয়। এই শাসনতন্ত্র রদ হয় ১৯৬৯ সালে। নতুন শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে গণপরিষদ গঠনের জন্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নিয়ে জেনারেল ইয়াহিয়া খান জারি করেন আইনগত কাঠামো আদেশ। তার ২০ সংখ্যক ধারায় অন্য বিষয়ের মধ্যে বলা হয়েছিল যে, নতুন শাসনতন্ত্রে (ক) পাকিস্তান পরিচিত হবে ইসলামি প্রজাতন্ত্র বলে; (খ) পাকিস্তান সৃষ্টির ভিত্তি যে-ইসলামি ভাবাদর্শ তা রক্ষা করা হবে ; এবং (গ) রাষ্ট্রপ্রধান হবেন একজন মুসলমান। এই কারণে ১৯৭০ সালে যেসব রাজনৈতিক দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, কুরআন ও সুন্নার পরিপন্থী আইন-প্রণয়ন থেকে বিরত থাকার প্রতিশ্রুতি তাঁদের প্রত্যেককেই দিতে হয়েছিল।

পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠার পূর্বে রাষ্ট্রের ভাবাদর্শ সম্পর্কে যেখানে কোনো স্থিরসিদ্ধান্ত ছিল না, সেখানে পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠার পরে ইসলামিকরণের এই ধারাবাহিক প্রয়াস বিস্ময়কর মনে হতে পারে। তবে তার চেয়ে বিস্ময়কর ছিল এই যে, মজলিসে আহরার ও

জামায়াতে ইসলামীর মতো যেসব সংগঠন পাকিস্তান-দাবির তীব্র বিরোধিতা করেছিল, পাকিস্তান-সৃষ্টির পর পরই দেশকে ইসলামিকরণের দাবিতে তারাই হয়ে পড়ে উচ্চকণ্ঠ। ভাবটা এমন ছিল, যেন তারাই একটি ইসলামি রাষ্ট্রের গোড়াপত্তনের জন্যে পাকিস্তান অর্জন করেছিল। রাষ্ট্রক্ষমতায় সরাসরি যাওয়ার সম্ভাবনা এদের ছিল না। তাই ইসলামকে জাতীয় ভাবাদর্শরূপে রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে স্থাপন করে সেই ভাবাদর্শের বিশেষজ্ঞ ও ব্যাখ্যাতা হিসেবে তারা ক্ষমতার কাছাকাছি যেতে চেয়েছিল। ধর্মভিত্তিক এইসব রাজনৈতিক দলের ইসলামের রক্ষক হওয়ার দাবি নস্যাৎ করার জন্যে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ নিজের থেকেই রাষ্ট্রের ইসলামিকরণের উদ্‌যোগ নিয়ে থাকতে পারে। তবে একটি বড় কারণ ছিল, ইসলামের নামে প্রদেশগুলোর ন্যায্য দাবি এবং বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়াস রোধ করা। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বাংলার দাবি অগ্রাহ্য করার জন্যে যেমন ইসলাম ও জাতীয় ঐক্যের ধুয়া তোলা হয়েছিল, তেমনি শক্তিশালী কেন্দ্রের পক্ষেও ধর্ম ও সার্বভৌমত্বের দোহাই দেওয়া হয়েছিল। ইসলামের কথা বলে পূর্ব বাংলার জনগণকে বিভক্ত রাখতে পারলে তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় আর পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক শাসকশ্রেণীর আশঙ্কার কিছু ছিল না। ক্ষমতার ভিত্তি সুদৃঢ় করার এবং জনসাধারণকে ভুলিয়ে রাখার রাজনৈতিক প্রয়োজনে তাই শাসকদের প্রয়োজন ছিল ধর্মকে ব্যবহার করার। নইলে যেসব নেতার ব্যক্তিগত জীবনযাপন-পদ্ধতিতে ইসলামি অনুশাসন-লঙ্ঘনই ছিল স্বাভাবিক, রাষ্ট্রের ইসলামিকরণে তাঁদের আগ্রহ যে আন্তরিক ছিল, তা বিশ্বাস করা কঠিন। ১৯৫৪ সালে পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জেনারেল ইসকান্দার মির্জার একটি উক্তি বরঞ্চ তাঁর বিশ্বাসজাত মনে হয়। তিনি বলেছিলেন যে, তাঁর ব্যক্তিগত মত এই যে, ধর্ম ও রাজনীতিকে পৃথক করা যায় এবং তাদের পৃথক রাখাই উচিত।

পাকিস্তানে যে ইসলামিকরণ ঘটেছিল, তার প্রকৃতিও এ-প্রসঙ্গে বিবেচ্য। ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রের নাম ছিল ইসলামি প্রজাতন্ত্র এবং এতে বিধান ছিল যে, ইসলামি আদর্শ বাস্তবায়নের পরামর্শ দেওয়ার জন্যে একটি কমিশন গঠিত হবে ; রাষ্ট্রপ্রধান সেই কমিশনের সদস্য নিয়োগ করবেন, তবে তাতে আলেমদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার বাধ্যবাধকতা ছিল না। রাষ্ট্রপ্রধান হবেন একজন মুসলমান— এবং, বলাবাহুল্য, পুরুষ— কিন্তু রাষ্ট্রের ক্ষমতা ন্যস্ত থাকবে মন্ত্রিসভার হাতে, অথচ সরকার-প্রধানের মুসলমান হওয়ার আবশ্যকতা ছিল না। কুরআন ও সুন্নার পরিপন্থী কোনো আইন প্রণীত হবে না, এমন বিধান করা হয়েছিল ; কিন্তু আইনের উৎস হিসেবে ইসলামি শরা-শরিয়ত ও প্রথা-ঐতিহ্যের উল্লেখ করা হয়নি। মূলত ব্রিটিশ ভারতে গৃহীত আইন ও বিচারব্যবস্থাই টিকিয়ে রাখা হয়েছিল। আধুনিক রাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত-অনুসরণে বিধিবদ্ধ হয়েছিল নাগরিক-অধিকার। ১৯৫৬ সালে বিবাহ ও পারিবারিক আইন-সংক্রান্ত কমিশন যে সুপারিশ করেন, তা-ই ১৯৬১ সালে মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের রূপ পরিগ্রহ করে। তাতে আলেমদের সমর্থন আদায় করা গেলেও, প্রথাগত দৃষ্টিতে তা যে ইসলামি বিধানের গণ্ডি অতিক্রম করে গিয়েছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম। যে আইউব খান এই অধ্যাদেশ জারি করেন, ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রে ইসলামকে রাষ্ট্রের ভাবাদর্শ করার প্রস্তাবে তিনি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিলেন এই

ভেবে যে, দুনিয়ার লোকে কী মনে করবে! তিনিই আবার, ১৯৬৫ সালের প্রেসিডেন্ট-নির্বাচনে ফাতেমা জিন্নাহ্‌র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখে, আলেমদের কাছ থেকে এই মর্মে ফতোয়া আদায় করেছিলেন যে, নারীর পক্ষে রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া ইসলামসম্মত নয়। তবে তাঁর ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রেও ইসলামের বিধি-বিধানের প্রয়োগযোগ্যতা ছিল ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের মতোই। অর্থাৎ প্রকৃত ইসলামি রাষ্ট্রগঠনের অভিপ্রায় বা উদ্‌যোগ তেমন দেখা যায়নি, কিন্তু ইসলামি আবরণ ছিল, রাজনৈতিক প্রয়োজনে ইসলামকে যথাসম্ভব ব্যবহার করা হয়েছিল।

ধর্ম ও রাজনীতির সংমিশ্রণে অগ্রণী ছিল কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ (পরে কনভেনশন মুসলীম লীগ) এবং বিরোধী জামায়াতে ইসলামী— এই দুটি দল। কেন্দ্রে আর যারা ক্ষমতায় এসেছিল স্বল্পকাল— রিপাবলিকান পার্টি, আওয়ামী লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি— তারা কেউই ইসলামিকরণ চায়নি। ছোট দলের মধ্যে ইসলামিকরণের পক্ষে পশ্চিমাঞ্চলে ছিল মজলিসে আহ্‌রার ও জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম এবং পূর্বাঞ্চলে নেজামে ইসলাম ও খিলাফতে রব্বানি পার্টি। প্রথমটি অচিরে বিলুপ্ত হয়ে যায়, শেষোক্ত দুটির কোনো প্রভাব ছিল না। জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম কিছুকাল পরে বিভক্ত হয়ে যাওয়ায় তাঁদের রাজনৈতিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে। জামায়াতে ইসলামীই ছিল প্রকৃত সংগঠিত দল, নির্বাচনে ভালো না করলেও তাদের আহমদিয়া— বিরোধী আন্দোলন পাঞ্জাবে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ও সামরিক বাহিনীতে জামায়াতের প্রভাব ছিল। ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে ইসলামিকরণের মাত্রা নিয়ে জামায়াতের বিরোধ ছিল, কিন্তু ভূমিসংস্কার ইত্যাদি প্রশ্নে জামায়াতের ধর্মব্যাখ্যা ক্ষমতাসীনদের ইহজাগতিক স্বার্থের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল।

পাকিস্তানের এই ইসলামিকরণ-প্রক্রিয়ায় পূর্ব বাংলার সায় ছিল না। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বাংলার ন্যায্য অধিকার প্রত্যাখ্যান করা হয় ইসলামের নামে; *হরফুল কুরআন* বলে অভিহিত করে আরবি হরফে বাংলা লেখার উদ্‌যোগ নেওয়া হয় সরকারিভাবে ; বাংলাভাষায় ঢালাওভাবে অপ্রচলিত আরবি-ফরসি শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটানো হয়— তাও ইসলামের নামে। পূর্ব বাংলা তার কোনোটাই মেনে নেয়নি। *অবজেকটিভ রেজোলিউশন* এবং মূলনীতি কমিটির রিপোর্টের প্রবল বিরোধিতা হয় এখানে। ১৯৫০ সালের ফেব্রুয়ারিতে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র-সম্পর্কিত জাতীয় মহাসম্মেলনে প্রস্তাব গৃহীত হয় যে, 'পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্র হবে সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র'। ১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনের পরে পূর্ব বাংলায় অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। ততদিন পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ ছিল একমাত্র অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান। ভাষা-আন্দোলনের পর গড়ে ওঠে প্রথম অসাম্প্রদায়িক ছাত্র-সংগঠন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন এবং অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক সংগঠন গণতন্ত্রী দল। এ কথা অবশ্য ঠিক যে, ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের একুশ দফা নির্বাচনী কর্মসূচির শীর্ষদেশে 'নীতি' বলে অঙ্গীকার করা হয়েছিল যে, 'কোরান ও সুন্নার মৌলিক নীতির খেলাফ কোন আইন প্রণয়ন করা হইবে না এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকগণের জীবনধারণের ব্যবস্থা করা হইবে।' তবে এতে রাষ্ট্রের ইসলামিকরণ পর্যন্ত যাওয়া হয়নি আর এতে যতটা মওলানা ভাসানীর নিজস্ব নীতি ও অভিপ্রায়ের

প্রতিফলন ঘটেছিল, অতটা হয়তো যুক্তফ্রন্টের নয়। এটা যুক্তফ্রন্টের সম্মিলিত মত হলে একটি দফারূপে গণ্য হতে পারতো। হয়তো এটা কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল, যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগের অনৈসলামিকতার অভিযোগের প্রতিষেধক হিসেবে। যুক্তফ্রন্টের বিজয়লাভের আগে মুসলিম ছাত্রলীগের নাম থেকে এবং পরে আওয়ামী মুসলিম লীগের নাম থেকে মুসলিম শব্দ বর্জিত হয়। ১৯৫৬ সালে শাসনতন্ত্র-প্রণয়নের সময়ে গণপরিষদে রাষ্ট্রের ইসলামি প্রজাতন্ত্র নামকরণের বিরোধিতা করে আওয়ামী লীগ। একই সময়ে পূর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থাপক পরিষদে যুক্ত নির্বাচন প্রথার পক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং পূর্বাঞ্চলে এই ব্যবস্থা শাসনতন্ত্রের অংশ হয়ে পড়ে। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি— এবং দল বিভক্ত হওয়ার পরে এর উভয় অংশ, — বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন এবং অধিকাংশ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ক্রমশ ধর্মনিরপেক্ষ মনোভাবের প্রসার ঘটাতে সাহায্য করে। অপরপক্ষ নীরব ছিল না এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে, ১৯৬৯ সালে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারের বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। ১৯৭০-এর সেপ্টেম্বরে আইনগত কাঠামো আদেশের পূর্বোদ্‌ধৃত ২০ ধারা বাতিলের দাবি জানায় ছাত্রলীগ এবং ১৯৭১-এর ফেব্রুয়ারিতে ছাত্র ইউনিয়ন প্রস্তাব করে যে, 'রাষ্ট্র হইবে ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র'।

অচিরেই শুরু হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। এ দেশের রাষ্ট্রীয় চরিত্র যে ধর্মীয় হবে না, তার প্রথম আভাস পাওয়া যায় ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিলের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে। এতে বাংলাদেশকে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশ একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হবে, মুক্তিযুদ্ধের কালে নেতারা সেকথা বহুবার বলেছিলেন। শুধু প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ নন, অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ এইচ এম কামরুজ্জামান, এমনকি, পররাষ্ট্র-মন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদের বক্তৃতায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় তিন নীতির— গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার— কথা একাধিকবার বলা হয়েছিল। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বঙ্গবন্ধু যেদিন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন, সেদিন রেসকোর্সের জনসভায় বক্তৃতাদানকালে তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে, 'বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র 'বাংলাদেশ' রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা।' পরে তিনি আরো একটি নীতি যোগ করেন— জাতীয়তাবাদ। ১৯৭২ সালে এই চার নীতিকেই বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রীয় মূলনীতির মর্যাদা দেওয়া হয়।

তিন

ধর্ম ও রাজনীতির সংমিশ্রণ দেশের মানুষকে কিভাবে বিভক্ত করে এবং তার বিকাশের পথ রুদ্ধ করে, তার পরিচয় আমরা পাকিস্তানের দিনগুলোতে পেয়েছি। ১৯৭১-এ দেখলাম তার ভয়ংকর রূপ। ইসলাম ও মুসলিম রাষ্ট্রের নামে কী অমানুষিক নির্যাতনই না তখন সংঘটিত হয়েছিল! পাকিস্তান সেনাবাহিনীর এদেশী দোসরেরা ধর্মের নামে সকল বর্বরতার প্রতি সমর্থন জানালেন, নিজেরাও তাতে অংশগ্রহণ করলেন। ইসলাম ও পাকিস্তানকে অভিন্ন বলে দাবি করে তাঁরা ঘোষণা করলেন যে, পাকিস্তানের বিরোধিতা মানেই ইসলামের বিরোধিতা। যেন পাকিস্তানসৃষ্টির আগে ইসলামের কোনো অস্তিত্ব ছিল না!

এই অভিজ্ঞতা ১৯৭২ সালে আমাদের মনে তাজা ছিল। তাই যে-সংবিধান আমরা তখন রচনা করেছিলাম, তাতে একদিকে ধর্মনিরপেক্ষতা গৃহীত হয় একটি মূল রাষ্ট্রীয় নীতি বলে, অন্যদিকে তেমনি ধর্ম নিয়ে রাজনীতির সুযোগ লোপ করে দেওয়া হয় সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদবলে। ওই অনুচ্ছেদে বলা হয়, ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাস্তবায়নের জন্যে সর্বপ্রকার সাম্প্রদায়িকতা, রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদাদান, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মের অপব্যবহার এবং কোনো বিশেষ ধর্মাবলম্বীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ করা হবে। তাছাড়া ৩৮ অনুচ্ছেদে, অন্য বিষয়ের মধ্যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসম্পন্ন বা লক্ষ্যানুযায়ী ধর্মীয় নামযুক্ত বা ধর্মভিত্তিক সমিতি বা সংঘ গঠন নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এই বিধানের আওতায়ই মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও নেজামে ইসলামের মতো যেসব রাজনৈতিক দলের সদস্যেরা মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগসাজশ করে কাজ করেছিলেন এবং যাদের সদস্যেরা তখনো গণরোষ থেকে আত্মরক্ষা করতে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন, সেসব রাজনৈতিক দল বেআইনি ঘোষিত হয়। বাংলাদেশে অবশ্য ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে আমরা রাষ্ট্র ও ধর্মের সম্পূর্ণ সংযোগহীনতা বুঝিনি। বরঞ্চ ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ আমরা করেছিলাম সকল ধর্মের সমান অধিকার অথবা দেশে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম ও সেসব ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে পক্ষপাতহীনতা। ফলে সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদের স্পষ্ট বিধান সত্ত্বেও ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রের প্রবণতা দেখা দেয় সকল ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদাদানের। তাই বেতারে, টেলিভিশনে, রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে— সর্বত্র কুরআন শরীফ, গীতা, বাইবেল ও ত্রিপিটক পাঠ হতে লাগলো একসঙ্গে এবং বঙ্গভবন বা গণভবনে মিলাদ-মহফিলও আয়োজিত হলো। পাকিস্তান-আমলে আমাদের চলতে হতো এক ধর্ম নিয়ে, বাংলাদেশে চলতে থাকলাম চার ধর্ম নিয়ে। কথায় কথায় রাষ্ট্রীয় পদাধিকারীরা ঘোষণা করলেন, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়।

ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে যাই বোঝানো হয়ে থাক না কেন, আমাদের মধ্যে কিছুসংখ্যক লোকের কাছে তা একেবারেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। তাঁরা ইসলামি প্রজাতন্ত্র পাকিস্তানের ধারায় আস্থাবান, মুসলমান-অমুসলমানের স্বতন্ত্র জাতিত্বে বিশ্বাসী, সকল ধর্মের গ্রন্থ ও অনুসারীদের সমান মর্যাদালাভ তাঁদের কাছে শোচনীয় ব্যাপার। ১৯৭৫ সালের পরে তাঁদের সুযোগ এলো। নিজের ক্ষমতার ভিত্তি সম্প্রসারণ করতে মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান মুক্তিযুদ্ধবিরোধীদেরকে ক্ষমতার ভাগ দিলেন এবং তা করতে গিয়ে রাষ্ট্রীয় মুলনীতিতে পরিবর্তন আনলেন। তবে এর ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হলো ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যমে রাজনীতির নতুন চর্চা করে। আওয়ামী লীগের আমলেই এক ধরনের আলেম ধর্মানুষ্ঠানে ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে বলে বেড়াতেন। সেজন্যে ১৯৭২ সালে মওলানা ভাসানী মসজিদে রাজনীতিচর্চা নিষিদ্ধ করার আহ্বান জানান। বঙ্গবন্ধু-হত্যার পরে ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার দায়িত্ব নিলেন এয়ার ভাইস-মার্শাল এম জি তাওয়াব। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তিনি জার্মানিতে ছিলেন, একবার কলকাতায় এসে, যুদ্ধে যোগ দিলে তাঁর পদমর্যাদা ও বেতন কী হবে, সে-নিয়ে দরদাম করে আবার জার্মানিতে ফিরে গিয়েছিলেন। জিয়াউর রহমান তাঁকে বিমানবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করলেন। ১৯৭৬ সালের মার্চ মাসে সিরাতুন্নবি উপলক্ষে ঢাকায় বিশাল

সমাবেশের আয়োজন করেন তাওয়াব। তাতে পাকিস্তান ও লিবিয়ার রাষ্ট্রদূতেরা যোগ দেন এবং ১৯৭১-এর যুদ্ধাপরাধী দেলোয়ার হোসেন সাঈদী সভাপতিত্ব করেন। সভায় অভিযোগ করা হয় যে, গত কয়েক বছরে বাংলাদেশে ইসলাম ও রসুল সম্পর্কে কোনো আলোচনা করা সম্ভবপর ছিল না। ধর্মনিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে এয়ার ভাইস মার্শাল ঘোষণা করেন যে, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের দায়িত্বভার 'আমাদের'। সঙ্গে সঙ্গেই মওলানা ভাসানী তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এক বিবৃতিতে বলেন যে, বিদেশী অনুপ্রেরণা ও অর্থের বলে প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক শক্তি সাম্প্রদায়িক আওয়াজ তুলছে এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদ্রোহী বক্তব্য উত্থাপন করছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এর দু মাস পরে, যখন সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদের পূর্বোল্লিখিত অংশ বাতিল করে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের কাজ করার সুযোগ করে দেওয়া হলো, তখন মওলানা ভাসানী এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানালেন।

প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জিয়াউর রহমান ১৯৭৭ সালের ২২ এপ্রিল একইসঙ্গে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তার পরদিনই এক ঘোষণাপত্র আদেশবলে তিনি সংবিধান সংশোধন করলেন। এই সংশোধনীর দ্বারা সংবিধানের প্রস্তাবনার শীর্ষদেশে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' সংযোজিত হলো, প্রস্তাবনায় 'জাতীয় মুক্তির জন্য ঐতিহাসিক সংগ্রামের' বদলে 'জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ঐতিহাসিক যুদ্ধ' বাক্যাংশ বসলো, রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতার জায়গায় এলো 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস', সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যায় সন্নিবেশিত হলো 'অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচার' এবং ১২ অনুচ্ছেদ উচ্ছেদ হয়ে গেল। ১২ অনুচ্ছেদের উচ্ছেদ এবং ৩৮ অনুচ্ছেদের আংশিক বিলুপ্তির ফলে বাংলাদেশে নতুন করে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি আমদানি হলো এবং মুক্তিযুদ্ধবিরোধী রাজনৈতিক দল ও ভাবের পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুযোগ এলো। পরে সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে এই ঘোষণাপত্র আদেশকে বৈধতা দেওয়া হয়।

এ কথা স্পষ্ট যে, এভাবে সংবিধান-সংশোধনের পশ্চাতে জিয়াউর রহমানের মনে কাজ করেছিল আওয়ামী লীগের সমান্তরালে তাঁর নিজস্ব ক্ষমতার ভিত্তি তৈরি করার উদ্দেশ্য। তাই মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকদের কাছে তাঁকে যেতে হয়েছিল। অনুরূপভাবে, ১৯৮২ সালে ক্ষমতা দখল করে জেনারেল এরশাদও নিজের ক্ষমতার ভিত্তি গড়ে তুলেছিলেন। ১৯৮৭ সালে তাঁর শাসন মুখোমুখি হয় বিরোধী দলের সম্মিলিত চ্যালেঞ্জের। মনে হয়, বি এন পি ও জামায়াতে ইসলামীর ধর্মসংক্রান্ত ভূমিকাকে টেক্কা দেওয়ার জন্যে কিছু একটা করার আবশ্যকতা তিনি অনুভব করেন। বি এন পি যদি বাংলাদেশে ইসলামকে ফিরিয়ে আনার দাবিদার হয় এবং জামায়াত যদি বাংলাদেশকে আদর্শ ইসলামি রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রতিশ্রুতি দেয়, তবে তিনি তাঁদেরকে ছাড়িয়ে যাওয়ার মতো ব্যবস্থা নেবেন। ১৯৮৮ সালে তিনি সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী আনলেন। তাতে বলা হলো ঃ 'প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করা যাইবে।' ইসলামের সঙ্গে অন্য ধর্মের কী বিপুল পার্থক্য করা হলো, সংশোধনীর ভাষা থেকে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সংবিধানে সকল নাগরিককে যে-সমান অধিকার দেওয়া হয়েছিল এবং আইনের দৃষ্টিতে যে সমতার

প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, এভাবে তা লঙ্ঘন করা হলো। অমুসলমানেরা কেবল যে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত হলেন, তা নয় ; তাঁদের পক্ষে সংবিধান-রক্ষার এবং এর প্রতি অনুগত থাকার শপথ নেওয়ার অর্থ হয়ে দাঁড়ালো বিসমিল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য-ঘোষণা।

বিশেষ ধর্মের প্রতি রাষ্ট্রের পক্ষপাতের ফলে যে নাগরিকদের মধ্যে বিভেদ ও বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়, এ কথা অনেকে মানতে চান না। তাঁরা যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টান্ত দেন। স্বাধীন ও সার্বভৌম জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভবের পরে ইউরোপে ক্রমে ধর্ম ও রাষ্ট্রের— *স্টেট* ও *চার্চের*— পৃথকীকরণ ঘটে এবং সকল নাগরিকের ইহলৌকিক কল্যাণসাধন রাষ্ট্রের দায়িত্ব বলে স্বীকৃত হয়। তা সত্ত্বেও ইউরোপের সব দেশে রাষ্ট্র ও ধর্ম পৃথক হয়নি। যুক্তরাজ্যের রাজা বা রানী চার্চ অফ ইংল্যান্ডের রক্ষাকর্তা— এই অর্থে অ্যাংলিকান চার্চের ধর্মই যুক্তরাজ্যের সরকারি ধর্ম। স্ক্যান্ডিনেভিয়ার একাধিক দেশ, আয়ারল্যান্ড, ইতালি ও স্পেনেও রাষ্ট্র বিশেষ বিশেষ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করে থাকে— তবে পৃষ্ঠপোষকতা বলতে আমরা যা বুঝি, সে-অর্থে নয়। অন্যদিকে ক্যাথলিক ধর্মের অসাধারণ প্রাধান্য সত্ত্বেও ফ্রান্স ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, প্রোটেস্টান্টদের গরিষ্ঠতা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। ইসলামি রাষ্ট্রসংস্থার (ও আই সি) অর্ধেক সদস্য-রাষ্ট্রেরই রাষ্ট্রধর্ম বলে কিছু নেই। ইন্দোনেশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত বা সিরিয়ার মতো দেশ রাষ্ট্রধর্ম স্বীকার করে না। তুরস্ক কেবল ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র নয়, তার সংবিধানের যে-কটি অনুচ্ছেদ কোনোভাবে সংশোধনযোগ্য নয়, ধর্মনিরপেক্ষতার বিধান তার মধ্যে একটি; সেদেশে সম্পত্তির উত্তরাধিকার এবং নারীর স্বাধীনতা-বিষয়ে ধর্মনিরপেক্ষ আইন প্রচলিত। সুতরাং কেবল উদাহরণ দিয়ে লাভ নেই, স্বদেশের অভিজ্ঞতা ও পরিস্থিতির ভিত্তিতেই এ-বিষয়ে করণীয় নির্ণয় করা আবশ্যক। ফরাসি বিপ্লবের আদর্শ ফ্রান্সকে ধর্মনিরপেক্ষ থাকার প্রেরণা দিয়েছে ; আদি বসতিস্থাপনকারীদের ধর্মীয়ভাবে নিপীড়িত হওয়ার অভিজ্ঞতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে বিশেষ কোনো ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হতে দেয়নি। পাকিস্তান আমলে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির যে-কুফল আমরা ভোগ করেছি, ধর্মের নামে যে-শোষণ ও নিপীড়ন এখানে চলেছে এবং বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠায় সকল সম্প্রদায়ের মানুষের মিলিত সংগ্রামের যে-ইতিহাস আমরা রচনা করেছি, তার পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শগ্রহণই আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক ও সংগত ছিল।

বাংলাদেশের সমাজে কি এমন কিছু ঘটেছিল, যা ধর্মনিরপেক্ষতা বর্জন করে রাষ্টধর্ম-গ্রহণকে অনিবার্য করে তুলেছিল? এতে সন্দেহ নেই যে, ব্যক্তিগত পর্যায়ে ধর্মীয় বিধিবিধান-পালনের প্রবণতা বাংলাদেশে বেড়েছে। মিলাদ, উরস ও সিরাতুননবির মতো ধর্মীয় ও আধা-ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের মাত্রাও বৃদ্ধি পেয়েছে। এসব অনুষ্ঠানে অনেক সময়েই মুসলমানের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যের কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থায় যে সেই স্বাতন্ত্র্য বিশেষভাবে রক্ষা করা দরকার, তাও প্রায়ই বলা হয়েছে। পীরদের প্রভাব ও সংখ্যা দুইই বৃদ্ধিলাভ করেছে। আধ্যাত্মিকভাবে শক্তিশালী ব্যক্তির সঙ্গে ইহজাগতিক ক্ষমতাশালী ব্যক্তির যোগাযোগ বহুক্ষেত্রে প্রথমজনের অনুসারী ও দ্বিতীয়জনের সমর্থক বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছে। মাদ্‌রাসার সংখ্যা বেড়েছে, মসজিদ-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার সংলগ্ন মক্‌তবের সংখ্যাও

বেড়েছে। এর অধিকাংশ ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলের, বিশেষত, জামায়াতের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদের আংশিক বিলুপ্তির পরে, ধর্মভিত্তিক বাজ নৈতিক দলের কার্যক্রম অবারিত হওয়ায়, পাকিস্তান-আমলের ইসলামি আদর্শের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং ইসলামি রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার দাবিও শোনা গেছে। পশ্চিম এশিয়ায় ইসলামের পুনরুত্থানের প্রভাব সত্তর দশকের মধ্যভাগে বাংলাদেশে অনুভূত হয় এবং সে-সময় থেকে উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম এশিয়ার অনেক কূটনীতিককে বাংলাদেশে নানারকম ধর্মীয়-রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতেও দেখা গেছে।

১৯৭১ সালে যেমন, তার পরেও তেমনি, বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তি সক্রিয় ছিল এবং সাম্প্রদায়িকতার প্রত্যাবর্তন ঘটছিল ধীরে ধীরে, এ কথা এখন বোঝা যায়। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে যেসব হিন্দু বাড়িঘর ফেলে ভারতে আশ্রয় নিয়েছিলেন, তাঁদের সকলে তা সহজে ফিরে পাননি। যাঁরা বহু আগে দেশ ছেড়ে, বিষয়সম্পত্তি বিক্রি করে, ভারতে চলে গিয়েছিলেন, তাঁরা ফিরে এসে ওসব সম্পত্তি দাবি করবেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরে এমন আশঙ্কা ছড়িয়ে গিয়েছিল। পুরোনো স্মৃতির সূত্র ধরে যাঁরা ফেলে যাওয়া ভিটে দেখতে এসেছিলেন, অনেক সময়ে তাঁদের আগমনেরও অন্য অর্থ করা হয়েছিল। সীমান্তে চোরাচালান এবং ভারতীয় পণ্যের বাজারজাতকরণ দেখা হয়েছিল হিন্দুদের শোষণরূপে। আওয়ামী লীগ সরকারকে ভারতের আজ্ঞাবহ বলে চিত্রিত করা এবং বাম ও দক্ষিণপন্থীদের ভারতবিরোধী প্রচারণাও আবহাওয়া কলুষিত করেছিল। এসব সত্ত্বেও ধর্মনিরপেক্ষতার উচ্ছেদ কিংবা রাষ্ট্রধর্ম-প্রতিষ্ঠার জন্যে জনসাধারণের পক্ষ থেকে কোনো দাবি কখনো ওঠেনি। রাষ্ট্রক্ষমতার নিয়ন্ত্রকেরা নিজের স্বার্থে ও নিজের উদ্‌যোগেই তা করেছিলেন। জিয়াউর রহমান সাংবিধানিক পরিবর্তন করেছিলেন সামরিক শাসনের সুযোগে— তাই সেখানে প্রতিবাদের সুযোগ কমই ছিল। কিন্তু এরশাদের রাষ্ট্রধর্ম-প্রবর্তনের বিরুদ্ধে যেমন রাজপথে প্রতিবাদ হয়েছে, তেমনি দেশের সর্বোচ্চ আদালতে মামলা রুজু হয়েছে। এ কথা স্বীকার্য যে, প্রতিবাদকারীরা ছিলেন মূলত শহুরে বুদ্ধিজীবী, সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু। পাকিস্তান-আমলে বা তার পরেও যে-ধরনের বিশাল বিক্ষোভ-সমাবেশ আমরা দেখেছি, তার সঙ্গে শক্তির দিক দিয়ে এই প্রতিবাদ তুলনীয় নয়। তাতে মনে হয়, জনসাধারণ এইসব সাংবিধানিক পরিবর্তন না চাইলেও, তাদের হাতে তুলে দেওয়া হলে, তারা তা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে। আবার এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, বাংলাদেশের যে-একমাত্র শাসক জনসাধারণকে রাষ্ট্রধর্ম উপহার দিয়েছিলেন, জনসাধারণই তাঁকে উৎখাত করে নির্বাচনের মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষতার সমর্থক আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় আনার ঝুঁকি নিয়েছিল এবং এবার ক্ষমতায় এনেছে।

বাংলাদেশে যাঁরা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করেন, তাঁরা ভারতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনারও সুযোগ নিয়েছেন। ১৯৭১-এ পাকিস্তানিদের দোসর মওলানা আবদুল মান্নানের মালিকানাধীন দৈনিক *ইনকিলাব* ১৯৯০ সালের ৩১ অক্টোবর বাবরি মসজিদ ভাঙার মিথ্যে সংবাদ পরিবেশন করে এবং এই ঘটনার প্রতিবাদে জমিয়তে মুদার্‌রেসিনের সভাপতিরূপে মওলানা মান্নানের জেহাদের আবেদন-সংবলিত বিবৃতি প্রকাশ করে দেশে সাম্প্রদায়িক নির্যাতন ঘটিয়েছিলেন। এই মিথ্যা সংবাদ প্রকাশের

জন্যে সরকার কারণ দর্শানোর নির্দেশ দিলে পরদিন পত্রিকাটি দুঃখপ্রকাশ করে রেহাই পেয়ে যায়। অনেকে সন্দেহ করেছিলেন যে, এরশাদ-বিরোধী চলমান আন্দোলন থেকে মানুষের দৃষ্টি ফেরানোর জন্যেই সরকারের সঙ্গে যোগসাজশে এ রকম পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছিল। সেইজন্যে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের তাৎক্ষণিক তবে অসংগঠিত প্রতিরোধ এসেছিল বেসরকারি মহল থেকে। ১৯৯২ সালে যখনি বাবরি মসজিদ সত্যিই ভাঙে, তখন নির্যাতনের মাত্রা হয়েছিল অনেক বেশি এবং কেবল মন্দির নয়, গির্জা ও বৌদ্ধমন্দির আক্রমণের খবরও পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এবারেও জনসাধারণ হাঙ্গামা প্রতিরোধ করতে এগিয়ে আসে, কোথাও কোথাও প্রশাসনও ব্যবস্থা নেয়, কিন্তু সরকার সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সত্যতাই অস্বীকার করেন। হিন্দুরা আওয়ামী লীগের ভোট ব্যাংক বলে পরিগণিত ; তাই অনেকে মনে করেন, তাঁদের নিরাপত্তার দায়িত্ব আওয়ামী লীগের। আবার অনেকে মনে করেন, আইন-শৃঙ্খলা-পরিস্থিতির দায়িত্ব সরকারের ; সুতরাং সংকটে অমুসলমানদের রক্ষা করা সরকারেরই কর্তব্য। মাঝে পড়ে সহায়হীনেরা অপ্রতিরোধ্য নির্যাতনের শিকার হয়।

১৯৯০ ও ১৯৯২-এর ঘটনা সংখ্যালঘুদের মনে অনাস্থার ভাব সৃষ্টি করেছে। এর ফলে একদিকে ঘটেছে নীরব দেশত্যাগ। কী সংখ্যক লোক যে দেশত্যাগ করেছেন, তা বলা দুষ্কর, কেননা সরকারি পরিসংখ্যানের বইতে এখন আর জনসংখ্যার ধর্মীয় বণ্টন দেখানো হয় না। অন্যপক্ষে সংখ্যাগুরুদের প্রাধান্যবিস্তার সংখ্যালঘুদের মধ্যেও এক ধরনের স্বাতন্ত্র্যবাদের সূচনা করেছে। রাষ্ট্রধর্ম-প্রবর্তনের পরে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্যপরিষদের প্রতিষ্ঠা তার একটি দৃষ্টান্ত। তাছাড়া, তাঁরা সরকারি কর্মে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব দাবি করেছেন, এমন কি, কোনো কোনো মহল থেকে সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার জন্যে স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতির পুনঃপ্রবর্তন কিংবা আসনরক্ষার দাবিও উত্থাপিত হয়েছে।

ধর্ম ও রাজনীতির সংমিশ্রণের অরেকটি ফল এই হয়েছে যে, যেসব রাজনৈতিক দল ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী, তাদেরকেও অবস্থাবৈগুণ্যে ধর্মীয় ধ্বনির আশ্রয় নিতে দেখা যায়। ১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনের সময়ে প্রচার চললো যে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় এলে 'বিসমিল্লাহ্' উঠে যাবে। এ প্রচারণায় কাজ হয়েছিল। আওয়ামী লীগ ধর্মনিরপেক্ষতা ছাড়লো না, কিন্তু ভয় পেয়ে 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি তুললো। ১৯৯৬-এর নির্বাচনেও আওয়ামী লীগের পোস্টারে-প্রচারপত্রে-বিজ্ঞাপনে 'আল্লাহু আকবর' দেখা গেল। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির অফিসেও এক সময়ে মিলাদ মহফিলের আয়োজন করা হয়েছে এবং ১৯৯১ সালে তাঁদের প্রার্থীর নির্বাচনী পোস্টার ও প্রচারপত্রে 'আল্লাহু আকবর' যোগ করা হয়েছিল।

ধর্ম ও রাজনীতির সংমিশ্রণ কেবল যে সংখ্যালঘুকেই বিপন্ন করেছে, তা নয়, সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়েরও কোনো কোনো গোষ্ঠীকে তা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। পাকিস্তানের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হয়ে আহমদিয়াদের অমুসলমান ঘোষণার দাবি জানিয়েছে জামায়াতে ইসলামী এবং আহমদিয়াদের মসজিদ, কেন্দ্র ও ঘরবাড়ি আক্রান্ত হয়েছে। জামায়াত শিয়াদেরকেও অমুসলমান ঘোষণার দাবি জানিয়েছে— যদিও শিয়াদের ওপর এখনো কোনো আক্রমণ হয়নি। বাংলাদেশের অনেক মসজিদেই খতিব ও ইমামেরা

রাজনৈতিক বক্তৃতা দিয়ে থাকেন এবং তা মূলত জামায়াতের রাজনীতির পক্ষেই দেওয়া হয়। ইসলামবিরোধী বক্তৃতাদান ও রচনাপ্রকাশের অভিযোগে কামরুল হাসান, আহমদ শরীফ ও তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করা হয়েছে মসজিদ থেকে। গ্রামাঞ্চলে স্থানীয় মসজিদের ইমাম ও মাদ্রাসার মুদাররিস মিলে অনৈতিকতার অভিযোগে ফতোয়া দিচ্ছেন। তাঁদের বেশির ভাগ ফতোয়া জারি হচ্ছে মেয়েদের বিরুদ্ধে এবং শাস্তিস্বরূপ তাঁরা পাথর ছুঁড়ে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার কিংবা বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা করেছেন। এতে কারো কারো মৃত্যু ঘটেছে এবং নূরজাহানের মতো কেউ কেউ অপমান সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করেছেন।

এই অবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের আত্মসমর্পণ না করে রুখে দাঁড়াতে হবে। ১৯৪৮-এ যাঁরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন, তাঁদের পক্ষে সেদিন জনসমর্থন ছিল না, তবু তাঁরা পিছপা হননি। পাকিস্তানের দ্বিজাতিতত্ত্বের আবহাওয়ায় এ তত্ত্বের বিরুদ্ধে এবং ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে কথা বলা সহজ ছিল না—সে কঠিন কাজ আমাদের নেতারা করেছিলেন। এসব দৃষ্টান্ত কি আজ অনুকরণীয় হবে না?

চার

বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহার সম্পর্কে আমরা এতক্ষণ যা বলেছি, তা থেকে কতকগুলো সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে পড়ে :

১. যাঁরা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেছিলেন, বাংলাদেশের সৃষ্টির পরে তাঁরা এ-রাষ্ট্রকে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন, কিন্তু এর মূলনীতিগুলোকে মানেননি। ১৯৭৫ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত, অর্থাৎ জিয়াউর রহমানের শাসনকালে, তাঁরা ক্ষমতাসীনদের সহায়তায় রাষ্ট্রযন্ত্রের ভেতর থেকে হোক, বাইরে থেকে হোক, এইসব রাষ্ট্রীয় মূলনীতি বিসর্জন দেওয়ার কাজটি করেছেন সুপরিকল্পিতভাবে এবং অনেকখানি সাফল্যের সঙ্গে।

২. পরবর্তী পর্যায়ে, অর্থাৎ ১৯৮২ থেকে ১৯৯০ সাল অবধি, এরশাদের আমলে রাষ্ট্রধর্ম-প্রবর্তন ও সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার মধ্যে দিয়ে পূর্ববর্তী সময়ের প্রবণতা রাষ্ট্রের কাঠামোয় স্থায়ী আসন লাভ করে এবং জনগণের ধর্মীয় পার্থক্য প্রকট আকার ধারণ করে।

৩. জাতীয় রাজনৈতিক আলোচনার (*ডিসকোর্স*) ক্ষেত্রে ইসলামি ভাবধারার কার্যকর প্রবর্তনের প্রয়াস দেখা যায় ১৯৯১ থেকে ১৯৯৫ সালের মধ্যে, অর্থাৎ খালেদা জিয়ার শাসনামলে। ব্লাসফেমি আইন-প্রবর্তনের উদ্‌যোগ, আহমদিয়া-বিরোধী আন্দোলন ও তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে প্রচারের ধারা তার দৃষ্টান্ত।

৪. ১৯৭৫ সাল থেকে পরবর্তী কুড়ি বছর রাজনৈতিক সুবিধা আদায় করার জন্যে ধর্মকে ব্যবহার করা হয়েছে।

৫. রাজনৈতিক ভাবাদর্শ (*আইডিওলজি*) হিসেবে ইসলামকে বাংলাদেশে প্রবর্তন করা হয়েছে।

তবে বাংলাদেশের সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতার উচ্ছেদ এবং সংবিধানের রাষ্ট্রধর্ম-সম্পর্কিত বিধানের সংযোজন দেশে প্রচলিত অন্যান্য আইনকে স্পর্শ করেনি। সেদিক দিয়ে দেখলে এই ইসলামিকরণ অনেকখানি ফাঁকা বুলির মতো। কিন্তু অন্যদিক দিয়ে এর তাৎপর্য গভীর। এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের ফসল বাংলাদেশে প্রথম থেকে যে-আদর্শ অনুসৃত হয়েছিল, স্বাধীনতা-অর্জনের ছয় বছরের মধ্যে তার জলাঞ্জলি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও আদর্শের পরাজয় বই কি! শান্তিতে অন্যান্য ধর্মপালনের প্রতিশ্রুতি যে বাস্তবে রক্ষা করা যায়নি, এ সত্যও বিস্মৃত হওয়া যায় না।

এ কথা বলা যেতে পারে যে, কিছুসংখ্যক দুর্বৃত্তের কাজ বড় করে দেখা যায় না এবং পৃথিবীর সর্বত্র সন্ত্রাসী আছে। তবে বিগত বছরগুলোতে ধর্ম ও রাজনীতির যোগ এত বেড়েছে যে, মানুষকে কিছুসংখ্যক ধর্মব্যবসায়ী অতি সহজে বিভ্রান্ত করতে পারছে এবং তাদের কার্যকলাপের ফলে রাষ্ট্রব্যবস্থায় ঘটছে বিশৃঙ্খলা।

বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে— বিশেষ করে, ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হওয়ায়— আমরা এমন সব প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছি যার সুস্পষ্ট উত্তর পাওয়া দরকার। এমন কিছু প্রশ্ন হলো :

১. ইসলাম ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের সহাবস্থান সম্ভবপর কিনা?

২. ইসলামে জাতীয়তাবাদের— বিশেষ করে, নানা ধর্মের অনুসারীদের সম্মিলিত জাতীয়তাবাদের— স্থান আছে কিনা?

৩. ইসলাম বা যে-কোনো সর্বজনীন ধর্মকে কোনো রাষ্ট্রবিশেষের ধর্ম বলে ঘোষণা করা সংগত কিনা?

৪. রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব জনগণের হওয়া ইসলামের দিক থেকে আপত্তিকর কিনা?

৫. যেখানে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, সেখানে আইন-প্রণয়নের অধিকার কাদের?

৬. ইসলামি অনুশাসন-অনুযায়ী রাষ্ট্রে একাধিক রাজনৈতিক দল থাকতে পারে কিনা?

৭. কাকে মুসলমান বলা যাবে? এ প্রশ্নের জবাব দেবার অধিকারই বা কার?

৮. রাষ্ট্রে অমুসলমানের বা নাস্তিকের অধিকার ভিন্ন বা সীমাবদ্ধ কিনা?

এসব বিষয় নিয়ে পাকিস্তান-আমলে বেশ কিছু তর্ক হয়ে গেছে, তবে তার যে সন্তোষজনক মীমাংসা হয়েছিল, এমন দাবি করা যায় না। তার কারণ, এসব বিষয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রই কোনো সমাধানে পৌঁছোবার চেষ্টা করেনি।

নিষ্পত্তির জন্যে এসব বিষয় রাষ্ট্র ছেড়ে দিয়েছিল আলেমদের হাতে, অথচ তাঁদের মধ্যে কোনো মতৈক্য ছিল না। মতৈক্য যে নেই, সেকথাটা বোঝাই আমাদের পক্ষে জরুরি। কেননা বাংলাদেশে যাঁরা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করছেন, তাঁরা নিজেদের মতকেই ইসলামের সর্বসম্মত বিধান বলে অন্যের উপরে চাপিয়ে দিতে চাইছেন।

কিছু উদাহরণ দিলে কথাটা স্পষ্ট হবে। *দীন* ও *শরিয়া* যে এক নয়, এ কথা বলে এসেছেন মিশরে মুফতি আবদুহু, ভারতে সৈয়দ আহমদ খান ও আবুল কালাম আজাদ। পাকিস্তানি তাত্ত্বিক ফজলুর রহমান এ দুটিকে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বলেছেন, এক বলেননি। তিনি আরো দেখিয়েছেন যে, ইসলামের প্রথম দেড়শ বছরে ইসলামি ধ্যানধারণা ও কর্তব্যবিশ্বাসের ব্যাখ্যায় *শরিয়া* শব্দের কোনো ব্যবহার ছিল না। বাংলাদেশের বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ আবুল হাশিম একবার বলেছিলেন যে, আল্লাহ্র

প্রতি আমার কর্তব্য আমার একান্ত নিজস্ব (*প্রাইভেট*), আর মানুষের প্রতি আমার কর্তব্য সার্বজনিক (*পাবলিক*)। অন্যপক্ষে মওদুদী খুব জোর দিয়ে বলেছেন যে, *দীন* ও *শরিয়া* অবিচ্ছেদ্য। সুতরাং এক মতে ইসলামের সঙ্গে ধর্মনিরপেক্ষতার বিরোধ নেই, অন্যমতে এই দুই একসঙ্গে চলতে পারে না। ইতিহাসবিদ্ আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ্ দেখিয়েছেন যে, ধর্ম ও রাষ্ট্রের ঐক্য ইসলামের আদর্শ হলেও বাস্তবে তা বেশিদিন ধরে রাখা যায়নি। তাই খলিফা, সুলতান বা আমীর এবং কাজী, ইমাম বা শেখুল ইসলামের পদ ভিন্ন হয়ে গিয়েছিল। ইমাম গাজ্জালিকে উদ্ধৃত করে হবিবুল্লাহ্ বলেছেন, এমন কি তিনিও ধর্মহীন রাষ্ট্রকে মেনে নেওয়ার যুক্তি দিয়েছিলেন। এ-প্রসঙ্গে পাকিস্তানি পণ্ডিত ইকবাল আহমেদ লিখেছেন যে, ইসলামের ১৪০০ বছরের ইতিহাসের ১১০০ বছরেই ধর্ম ও রাষ্ট্র পৃথক থেকেছে। তাঁর মতে, ধর্ম ও রাষ্ট্রের বন্ধন ছিন্ন হয় ৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে— যখন বুয়াহিদ শাহ্জাদা মুইনউদ্দোলা আহমদ রাজধানী বাগদাদ দখল করে ইহজাগতিক ও আধ্যাত্মিক নেতারূপে আব্বাসীয় খলিফার দ্বৈত ভূমিকার অবসান ঘটান। ইকবাল আহমেদ অবশ্য মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, অনেক গোঁড়া আলেমই খিলাফতে রাশেদীনের পরে আর ইসলামি রাষ্ট্রের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। সেক্ষেত্রে ৬৬০ খ্রিষ্টাব্দের পরে আর কোনো মুসলিম রাষ্ট্রকে ইসলামি রাষ্ট্র বলে অভিহিত করা যায় না। তিনি আরো বলেন যে, শিয়া আলেমরা আবার হজরত উমর ও হজরত ওসমানকে বৈধ খলিফা বলে বিবেচনা করেন না। তাতে ধর্ম ও রাষ্টের সম্পর্কচ্ছেদের তারিখ আরো পিছিয়ে দিতে হয়।

তেমনি হজরত মুহম্মদ-সম্পাদিত মদিনা চুক্তির দৃষ্টান্ত দিয়ে জামালউদ্দীন আল আফগানি ও মুফতি আবদুহুর বক্তব্য অনুসরণ করে আবুল কালাম আজাদ ও হুসেন আহমদ মদনি জাতীয়তাবাদী ভাবধারাকে ইসলামের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বলে দাবি করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন যে, *উম্মা* (সম্প্রদায়) ও *কওম* (জন বা জাতি) এক নয়। মুসলমানমাত্রই *উম্মার* অংশ; আর রাষ্ট্রের অধিবাসীদের নিয়ে— তারা যে সম্প্রদায়েরই হোক না কেন— গড়ে ওঠে *কওম*। *উম্মার* ক্ষেত্রে ভৌগোলিক সীমা প্রযোজ্য নয়, কিন্তু রাষ্ট্রমাত্রই ভৌগোলিক সীমানায় চিহ্নিত। নিখিল জীবনাদর্শ দিয়ে যেমন রাষ্ট্রীয় পরিচয় লঙ্ঘন করা চলে না, তেমনি *উম্মাকে* দিয়ে *কওমকে* অস্বীকার করা যায় না। এখানেও কেউ কেউ রাষ্ট্রকে অগ্রাহ্য করে সকল *মুমিনকে* মুসলিম জগতের নাগরিক বলে আখ্যায়িত করেন। জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে মওদুদীর তীব্র বিরোধিতার কথা আগে বলেছি। ১৯৬৬ সালে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত মিসরের আল ইখওয়ানুল মুসলেমিনের নেতা সৈয়দ কুতুবের একটি মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃতিযোগ্য : 'জাতীয়তাবাদ হলো ইমান, স্বদেশ দারুস সালাম, শাসনকর্তা আল্লাহ্তালা এবং সংবিধান কুরআন।' এ রকম উচ্চভাবমণ্ডিত বক্তব্য সত্ত্বেও বাস্তবক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যায় যে, যে-কোনো দেশের মুসলমানের পক্ষে অবশ্যপালনীয় হজব্রতের অধিকারও আর শর্তহীনভাবে স্বীকৃত নয়: তার নিজের রাষ্ট্র কিংবা সৌদি আরব তার গমনাগমনে বাধানিষেধ আরোপ করতে পারে।

এই একই পরিপ্রেক্ষিতে অনেক বিশ্বাসী মনে করেন, ইসলাম মুসলিম *উম্মার* ধর্ম, কিন্তু তা রাষ্ট্রবিশেষের ধর্ম হতে পারে না, বিশেষত যে-রাষ্ট্রে অমুসলমান নাগরিক

রয়েছে, সে-রাষ্ট্রের তো নয়ই। কোনো কোনো রাষ্ট্রে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের স্থান দেওয়া হয়েছে, এ কথা জেনেও তাঁরা মনে করেন যে, ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম করলে তাকে খর্ব করা হয় এবং সে-রাষ্ট্রের অমুসলমান অধিবাসীর অধিকার ক্ষুণ্ন করা হয়।

আধুনিক রাষ্ট্রে জনগণের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করা হয়ে থাকে। কোনো কোনো তাত্ত্বিক জনগণের সার্বভৌমত্বের ধারণা ইসলামের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বিবেচনা করেন না। তাঁরা মনে করেন, সার্বভৌমত্ব কেবল আল্লাহ্‌রই হতে পারে। আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব জনগণের মাধ্যমে প্রযোজ্য হবে কিনা, তাও বিতর্কের বিষয়। জনসাধারণ স্বাধীনভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন করবে এবং সেই প্রতিনিধিরা আইন-প্রণয়ন ও রাষ্ট্র-পরিচালনা করবেন, এ ব্যবস্থাও সকলে ইসলামসম্মত বলে মানেন না। তাঁরা মনে করেন, মুসলমানের জন্যে আইন-প্রণয়নের অধিকার আছে কেবল ইসলামধর্ম-বিশেষজ্ঞদের। তাই যদি হয়, তাহলে রাষ্ট্রে একাধিক দল, ভিন্ন ভাবাদর্শ এবং স্বতন্ত্র কর্মসূচির সুযোগ থাকে না। ইসলামকে যাঁরা কেবল ধর্ম হিসেবে না দেখে ভাবাদর্শ হিসেবে দেখেন, তাঁদের বিবেচনায়, ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ভাবাদর্শের অনুসরণ মুসলমানের পক্ষে সংগত নয়।

১৯৫৩ সালে জামায়াতে ইসলামীর উদ্‌যোগে পাঞ্জাবে আহমদিয়া-বিরোধী যে-দাঙ্গা সংঘটিত হয়, তার তদন্ত কমিশনের প্রধান— বিচারপতি মুনীর— তাঁর রিপোর্টে লিখেছিলেন যে, জিজ্ঞাসাবাদ করে তিনি দেখতে পান, কে যে মুসলমান সে-সম্পর্কে কোনো দুজন আলেম একমত নন। আমরা তখনো দেখেছি, এখনো দেখছি, কে মুসলমান আর কে মুসলমান নয়, তা নির্ধারণের দায়িত্ব কোনো কোনো রাজনৈতিক দল আত্মসাৎ করেছে। নিজেকে মুসলমান বলে অভিহিত করলে চলবে না, আল্লাহ্‌-রসুল-কুরআনে বিশ্বাস ঘোষণা করলে চলবে না, ওইসব দল ছাড়পত্র না দেওয়া পর্যন্ত কেউ নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করতে পারবে না। কে মুসলমান, কে মুসলমান নয়, সে-বিচারের ভার তাঁরা আল্লাহ্‌র ওপরেও ছেড়ে দিতে রাজি নন, কেননা তাঁদের লক্ষ্য যতোটা রাজনীতি, ততোটা ধর্ম নয়।

যেখানে মুসলমানদেরই এই হাল, সেখানে অমুসলমানদের কী দশা, তা সহজেই অনুমেয়। যেখানে নারীপুরুষ-নির্বিশেষে মুরতাদ ঘোষণা করে তার প্রাণদণ্ড দাবি করা হচ্ছে, সেখানে স্বঘোষিত নাস্তিকের কী অবস্থা হতে পারে, তা বুঝতেও বেশি কল্পনাশক্তির দরকার হয় না।

ধর্মকে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত করার কী পরিণাম হয়েছে বাংলাদেশে? শুধু যে মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী রাজনীতিবিদেরা রাজনীতি করার সুযোগ পেয়েছেন এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করতে সমর্থ হয়েছেন, তা নয়। দেশের সকল নাগরিক আর আইনের চোখে নিজেদের সমান ভাবতে পারছেন না, এটাই হয়েছে সবচেয়ে বড় ক্ষতি। বাংলাদেশকে যদিও ইসলামি রাষ্ট্র ঘোষণা করা হয়নি, কিন্তু সংবিধানের একটা আপাত-ইসলামি আকৃতি রচনা করা হয়েছে। তার ফলে নাগরিকেরা প্রথমে বিভক্ত হয়েছেন মুসলমান-অমুসলমানে। তারপর যাঁরা নিজেদের মুসলমান বলে দাবি করেন, তাঁদের কোনো কোনো অংশকেও— যেমন, আহমদিয়া ও শিয়াদের— অমুসলমান ঘোষণার দাবি জানানো হচ্ছে। এ-ধরনের আচরণ থেকে রাষ্ট্র কাউকে বিরত রাখারও চেষ্টা

করছে না। ফলে রাষ্ট্র ও তার অমুসলমান নাগরিকদের মধ্যে একটা দূরত্বের সৃষ্টি হচ্ছে এবং মুসলমান নাগরিকদের একাংশও রাষ্ট্রের কাছ থেকে নিজেদের ধর্মপালন ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত নিরাপত্তার নিশ্চয়তালাভের আশা করতে পারছেন না। ধর্ম ও রাজনীতির সংযোগ তাই বাংলাদেশের নাগরিকদের মৌলিক ঐক্য নষ্ট করেছে।

পুরুষ ও নারীর মধ্যে ইসলামি বিধিসম্মত পার্থক্যের কথাও ধর্মজীবী রাজনীতিবিদেরা খুব জোর গলায় প্রচার করে আসছেন। তবে এ-বিষয়ে তাঁদের বক্তব্যে ও আচরণে সর্বত্র সংগতি নেই। কখনো তাঁদের কেউ নারীর পক্ষে রাষ্ট্রের নেতৃত্বদান ইসলামবিরোধী বলে অভিহিত করেছেন, কখনো আবার তাঁরাই নারীকে নেতৃত্বে যেতে সাহায্য করেছেন (১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময়েও ঠিক একই ঘটনা ঘটেছিল)। কিন্তু নারী সম্পর্কে তাঁদের দৃষ্টি খুবই নঞর্থক। গ্রামাঞ্চলে, প্রধানত নারীর বিরুদ্ধে, ফতোয়াদানের যে প্রবণতার কথা আগে বলেছি, তা এই নেতিবাচক মনোভাবেরই এক ধরনের বহিঃপ্রকাশ। যাঁরা এসব করছেন, তাঁরা চান না যে, মেয়েরা লেখাপড়া শিখবে, উপার্জনক্ষম হবে, আত্মনির্ভরশীল হবে, স্বাধীন হবে। তাঁরা চান মেয়েদের ওপরে কর্তৃত্ব করতে, তাদের অন্ধকারে রাখতে, পুরুষের মুখাপেক্ষী করে রাখতে, পিঁজরায় পুরে রাখতে। তবে ফতোয়াবাজদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র বাধ্য হয়েই কিছু আইনি ব্যবস্থা নিয়েছে জনমতের চাপে পড়ে, এ কথাও স্বীকার্য।

ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে সচেতন নাগরিকেরা— নারীপুরুষ-নির্বিশেষে নানা ধর্মের লোকেরা এবং যাঁদের বিশেষ কোনো ধর্মবিশ্বাস নেই, তাঁরা— একযোগে দাঁড়িয়েছেন। কিন্তু একটা বড় ক্ষতি হয়েছে এই যে, ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা প্রতিক্রিয়াবশত স্বাতন্ত্র্যবাদের পথে খানিকটা অগ্রসর হয়েছেন এবং তাতে ধর্মবাদী রাজনীতিরই জয় হয়েছে। পঞ্চাশ দশকের শুরু থেকে সত্তর দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, দ্বিজাতিতত্ত্বের বিরুদ্ধে, স্বতন্ত্র নির্বাচনপ্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে আমরা জয়লাভ করেছিলাম এবং প্রতিষ্ঠা করেছিলাম বিশিষ্ট আদর্শভিত্তিক এক নতুন রাষ্ট্র। সেই বিজয়, সেই আদর্শ আমরা বিসর্জন দেবো না— মুক্তিযুদ্ধের রজতজয়ন্তীতে এই শপথই আমাদের নিতে হবে। এ সংকল্প যদি আমরা বাস্তবে রূপায়িত করতে পারি, আমাদের সকলের মনে যদি ধর্ম ও রাজনীতির সংস্রবের অপকার সম্পর্কে সচেতনতা জাগে, তবে রাষ্ট্রশক্তিকেও সেই আদর্শের পথে আবার পরিচালনা করতে আমরা সমর্থ হবো, মুক্তিযুদ্ধের রজতজয়ন্তীতে এই আশাবাদও আমি ব্যক্ত করতে চাই।

গ্রন্থপঞ্জি

Aziz Ahmad, *Islamic modernism in India and Pakistan 1857-1964*. London : Oxford University Press, 1967.

— *Studies in Islamic culture in the Indian environment*. London : Oxford University Press, 1967.

Rafiuddin Ahmed (ed), Islam in Bangladesh. Dhaka : Bangladesh Itihas Samiti, 1983.

— *Religion. nationalism and politics in Bangladesh.* New Delhi: South Asian Publishers. 1990.

Leonard Binder, *Religion and politics in Pakistan.* Berkeley and Los Angeles : University of California Press, 1961.

Olivier Carre *(ed)*, *Islam and the state in the world today. Reprinted*; New Delhi : Manohar, 1989.

Youssef M. Choueri, *Islamic Fundamentalism,* Reprnted; New Delhi : CBS Publishers, 1991.

Asghar Ali Engineer, *The Islamic state.* First paperback edn; New Delhi: Bikas Publishing House Pvt. Ltd, 1980.

P. Hardy, *The Muslims of British India.* London: Cambridge University Press. 1972.

Mohammad Asghar Khan (ed), *Islam, politics and the state: the Pakistan experience.* London: Zed books, 1985.

Bruce B. Lawrence, *Defenders of God.* San Francisco: Harper and Row, 1989.

Muhammad Munir. *From Jinnah to Zia.* Delhi : Akbar Publishing House, 1981.

Seyyed Vali Reza Nasr, *The Vanguard of the Islamic revolution The Jama'at- i-Islami of Pakistan.* Berkeley: University of California Press, 1994;

Syed Sharifuddin Pirzada (ed), *Foundations of Pakistan*, 2 vols. Karachi: National Publishing House, 1969-70.

Fazlur Rahman, *Islam.* Chicago: University of Chicago Press, 1966.

Khalid bin Sayeed, *Pakiatan: the formative phase 1857-1948.* 2nd edn; London: Oxford University Press. 1968;

The Political system of Pakistan. London: Oxford University Press, 1967.

Anil Seal, *The emergence of Indian nationalism.* London: Cambridge University Press, 1968;

W.C. Smith, *Islam in modern history.* Princeton. Princeton University Press, 1957.

— *Modern Islam in India.* 2nd edn ; London: Victor Golanz, 1945.

Davia Taylor and Malcolm Yapp (ed), *Political Identity in South Asia.* London: Curzon Press, 1978,

আনিসুজ্জামান, '*ধর্মরাষ্ট্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও রাষ্ট্রধর্ম*; 'শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মারক বক্তৃতা,' ঢাকা: ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯২ ;

বাংলাদেশে মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা। ঢাকা: স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটি, ১৯৮৯;

রামেন্দু মজুমদার (সম্পাদিত), *বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ।* ঢাকা: কথন প্রকাশনী, ১৯৭৪।

হাসান মোহাম্মদ, *জামায়াতে ইসলামি বাংলাদেশ নেতৃত্ব, সংগঠন ও আদর্শ।* ঢাকা: একাডেমিক পাবলিশার্স, ১৯৯৩।

হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), বাংলাদেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধ দলিলপত্র, ১-৩ খণ্ড। ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮৩।

পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গ

পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে আমি বিশেষজ্ঞ নই। তবে একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে সেখানকার সমস্যা নিয়ে আমি উদ্‌বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত এবং এর আশু সমাধান কামনা করি। সমস্যাটি বেশ জটিল আকার ধারণ করেছে, ফলে এর সমাধান একদিনেই হয়ে যাবে, এমন আশা করা দুরূহ। তবে সমাধানের প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে— যত তাড়াতাড়ি হয়, তত মঙ্গল। হাতে হাতে ফল পাওয়া না গেলেও তাতে অদূর ভবিষ্যতে সুফল আশা করা যায়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল দেশের মোট এলাকার এক-দশমাংশ। জনসংখ্যা এক শতাংশের কম, তার মধ্যে পাহাড়িদের সংখ্যা ০.৫ শতাংশের মতো। বাকিরা সমতলভূমির মানুষ, সেখানে গিয়ে বসতি স্থাপন করেছে। ১৮৭২ সালে ওই অঞ্চলে পাহাড়িরা ছিল ৯৮.২৬ শতাংশ, বাঙালিরা ১.৭৩ শতাংশ। ১৯৫১ সালে এই হার দাঁড়ায় যথাক্রমে ৯০.৯১ এবং ৯.০৮ শতাংশে। ১৯৯১-তে সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে ৫ লক্ষ পাহাড়ি, আর ৪.৭ লক্ষ বাঙালি। পাহাড়ি-বাঙালি জনসংখ্যাবৃদ্ধিতে ভারসাম্যের অভাব সেখানকার একটা বড় সমস্যায় পরিণত হয়েছে।

পাহাড়িদের মধ্যে তেরোটি নৃগোষ্ঠী আছে, তার মধ্যে চাকমারাই প্রধান। প্রত্যেক গোষ্ঠীরই স্বতন্ত্র জাতিসত্তা এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য আছে। পাহাড়িদের মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও প্রাণী-পূজারী আছে। তবে সব গোষ্ঠীই বাঙালিদের চেয়ে আলাদা। আবার রাজনৈতিক কারণে সকল পাহাড়ি নৃগোষ্ঠীকে এখন এক জুম্ম জাতি বলে অভিহিত করা হচ্ছে। কিন্তু বংশপরম্পরায় এসব গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যগত স্বাতন্ত্র্য এবং বর্তমান বৈষয়িক অবস্থার ভেদ উপেক্ষণীয় নয়।

পাহাড়িরা নিজেদের অধিকারের প্রশ্নে বারে বারে ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রবিধানের *(চিটাগাং হিল ট্র্যাক্টস রেগুলেশন অফ নাইনটিন হানড্রেড)* উল্লেখ করেন। আপাতদৃষ্টিতে এতে পাহাড়িদের— তখন যাদের উপজাতীয় বলা হতো, তাদের— স্বার্থরক্ষা করা হয়েছিল বলে মনে হয়, কিন্তু এ-প্রবিধান আসলে ব্রিটিশ শাসনকেই পোক্ত করেছিল। ততদিনে ব্রিটিশদের সঙ্গে পাহাড়িদের যুদ্ধবিগ্রহ শেষ হয়ে গেছে, পাহাড়িরা ব্রিটিশদের সার্বভৌমত্ব মানতে বাধ্য হয়েছে, জুম চাষের জায়গায় লাঙলের কৃষি প্রবর্তন করতে গিয়ে গুলি পর্যন্ত চলেছে, বাঙালিরা নানারকম কাজকর্মে জড়িয়ে পড়েছে, বিশেষ করে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও প্রশাসনে তাদের একরকম প্রাধান্য বিস্তৃত হয়েছে। এই অবস্থায় এই প্রবিধানে এক ধরনের দ্বৈত শাসন চালু হয়। পার্বত্য চট্টগামকে 'বহির্ভূত এলাকা' বলে চিহ্নিত করে এখানে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের প্রশাসন প্রবর্তিত হয়। এখানকার ডেপুটি কমিশনার (ডি সি) অন্য যে-কোনো জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতাধর হয়ে পড়েন। পুরো এলাকাকে একদিকে তিনটি মহকুমায় ভাগ করে তিনজন মহকুমা অফিসারের (এস ডি ও) অধীনে ন্যস্ত করা হয়; অন্যদিকে পার্বত্য চট্টগ্রামকে তিনটে সার্কলে ভাগ করে উপজাতীয়দের মধ্য থেকে

তিনজন প্রধান— পরে তাঁরা রাজা বলেই পরিচিত হন— নিয়োগ করা হয়। ডি সির সম্মতিক্রমে তাঁরা মৌজার দেওয়ান এবং পাড়ার কারবারি নিযুক্ত করতেন— এতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের খানিকটা আদল দেখা যায়। ডি সির অনুমতি ছাড়া বহিরাগতরা এখানে প্রবেশ করতে, বসবাস করতে কিংবা জমি কিনতে পারতেন না। সে-অনুমতি দেওয়া হতো মূলত শিল্প-বাণিজ্যের উদ্যোক্তাদের এবং খানিকটা বাসস্থানের জন্যেও।

১৯৪৭ সালে পাহাড়িরা নিজেদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জন্যে একটা প্রদেশের মর্যাদা দাবি করে। কিন্তু পূর্ববঙ্গের সঙ্গে পার্বত্য এলাকার অর্থনীতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত বলে বিদায়ী ইংরেজ প্রভুরা একে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেন। পাহাড়ি নেতাদের অনেকেই এই এলাকার ভারতভুক্তির পক্ষপাতী ছিলেন। পাকিস্তানকে মেনে নিতে তাঁদের অস্বীকৃতি ছোটখাটো বিদ্রোহের রূপ নেয়। পাকিস্তান-প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরে সামরিক অভিযান চালিয়ে সে-বিদ্রোহ দমন করা হয়।

আইউব খানের উন্নয়ন-দশকে কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প কার্যকর হয়। এতে জেলার ৪০ শতাংশ চাষযোগ্য জমি পানিতে তলিয়ে যায়। ফলে কয়েক হাজার বাঙালি এবং লক্ষাধিক পাহাড়ি নিজেদের জমি থেকে উচ্ছেদ হতে বাধ্য হয়। উচ্ছেদকৃত পাহাড়িরা এ ঘটনাকে তাদের প্রতি সমতলবাসীর অন্যায় আচরণ হিসেবেই দেখে এবং এর দাগ প্রগাঢ় হয় এই কারণে যে, উচ্ছেদকৃত পাহাড়িরা যথাযথ ক্ষতিপূরণলাভ থেকেও বঞ্চিত হয়। অন্যদিকে এই সময়ে ১৯০০ সালের প্রবিধানটি রহিত করা হয় এবং বহিরাগতদের সম্পত্তিলাভের অধিকার নিশ্চিত হয়। বাঙালিরা আগে থেকেই ব্যবসা-বাণিজ্য চাকরি-বাকরিতে যে প্রাধান্য লাভ করে এসেছিল, তার সঙ্গে এখন নতুন করে তাদের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পায়। ষাট দশকে পার্বত্য চট্টগ্রামে কিছু কিছু উন্নয়ন যে হয়নি, তা নয়। তাতে পাহাড়িরা— বিশেষত, চাকমারা— লেখাপড়া শিখে, সরকারি চাকরিলাভ করে এবং প্রথাগত ব্যবসা চালিয়ে নিজেদের বৈষয়িক উন্নতি লাভ করতে সমর্থ হয় এবং তার ফলে পাহাড়ি-বাঙালি বৈষম্য সম্পর্কে সচেতন হতে শুরু করে।

এদিকে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানীরা পূর্ববঙ্গের প্রতি যে বৈষম্যমূলক আচরণ করে, তাতে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদের একটা প্রবল ঢেউ জেগে ওঠে। এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে কিংবা পাকিস্তানিদের বৈষম্যমূলক আচরণের প্রতিবাদে পাহাড়িরা কোনো ভূমিকা নেয়নি।

বরঞ্চ ভারতবিরোধী কাজকর্মে পার্বত্য চট্টগ্রামের মাটি ও মানুষকে পাকিস্তান সরকার যেভাবে ব্যবহার করেছিল, তাতে কেন্দ্রের সঙ্গেই পাহাড়িদের যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়। আওয়ামী লীগের ছয় দফা কর্মসূচির মধ্যেও এমন কিছু ছিল না যা পাহাড়িদের স্বতন্ত্র সমস্যাকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে এবং ওই পরিস্থিতিতে তা স্বাভাবিক ছিল।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে পরাজিত করে জাতীয় সংসদে রাজা ত্রিদিব রায় এবং প্রাদেশিক পরিষদে মানবেন্দ্রনাথ লারমার সদস্যপদ-লাভ

বাঙালি-পাহাড়ির মানসিক দূরত্বকে প্রতিফলিত করেছিল, কিন্তু তার তাৎপর্য আমাদের কাছে তখন বোধগম্য হয়নি।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে মানবেন্দ্র লারমার নেতৃত্বে কিছুসংখ্যক পাহাড়ি তাতে যোগ দেয়। তার চেয়ে বেশিসংখ্যক পাহাড়ি এবং তাদের দুজন নেতা, রাজা ত্রিদিব রায় ও অংশু প্রু চৌধুরী, পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করেন। প্রথম জন বহির্বিশ্বে পাকিস্তানের পক্ষে প্রচার করেন, দ্বিতীয়জন ড. মালেকের মন্ত্রিসভার সদস্যপদ গ্রহণ করেন। তার চেয়েও বেশিসংখ্যক পাহাড়ি মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে উদাসীন ছিল। ফলে আমাদের চোখে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক পাহাড়িরা ব্যতিক্রম এবং পাকিস্তানের পক্ষপাতী পাহাড়িরাই নিয়ম বলে প্রতিভাত হয়। মুক্তিযুদ্ধে আমাদের বিজয়লাভের পরে পাকিস্তানপন্থীরা অনেকেই পার্বত্য চট্টগ্রামে আশ্রয় লাভ করে। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ ও ভারতের মিলিত সামরিক অভিযানে বাংলাদেশ-বিরোধী এসব ক্ষেত্র ধ্বংস করা হয়।

১৯৭২ সালে সংবিধান-প্রণয়নের সময়ে যখন বাংলাদেশের নাগরিকদের পরিচয় বাঙালি হবে বলে স্থির করা হয়, তখন মানবেন্দ্র লারমা উপজাতিদের পক্ষ থেকে প্রবল আপত্তি করেছিলেন। তিনি উপজাতীয়দের স্বতন্ত্র সত্তার ওপরে জোর দেন এবং বলেন যে, তাঁরা বাংলাদেশি হতে রাজি, তবে বাঙালি হতে সম্মত নন। বাংলাদেশের ভাষা ও সংস্কৃতিগত প্রায়-সমজাতীয়তা, পূর্ববর্তী ২৪ বৎসরের রাজনৈতিক সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধকালীন অভিজ্ঞতা এবং নতুন রাষ্ট্রলাভের আনন্দ— এ সবকিছুর পরিপ্রেক্ষিতে সেদিন লারমার বক্তব্য বাঙালিবিরোধী এবং নতুন জাতির জন্যে ভেদমূলক স্বাতন্ত্র্যপন্থী বলে মনে হয়েছিল। আমরা তাই পাহাড়িদের বাঙালি হতে বলে সমজাতীয় জাতি-রাষ্ট্র গঠনের পথকে ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু পাকিস্তানের ২৪ বছরে জাতিগত নিপীড়নের শিকার হয়েও পাহাড়িদের ওপরে জাতিগত নির্যাতনের সম্ভাবনা বা আশঙ্কাকে ঠিকমতো দেখতে পাইনি।

১৯৭২ সালেই মানবেন্দ্র পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি পরিষদ গঠন করেন এবং অচিরে এর সামরিক শাখা শান্তিবাহিনী গঠিত হয়। সরকারী উদ্‌যোগে ১৯৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, কিন্তু এই বোর্ড তেমন কিছু কাজ করার আগেই সংঘটিত হয় বঙ্গবন্ধু-হত্যা এবং রাজনৈতিক আমলের পরিবর্তন। এর পরপরই ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মানবেন্দ্রের যোগাযোগ হয় এবং প্রতিবেশী রাষ্ট্রে শান্তিবাহিনী আশ্রয় পায়। নতুন শাসনামলে পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বায়ত্তশাসন দাবির উত্তরে বড়রকম সামরিক শক্তি প্রয়োগ করা হয় এবং ১৯৭৭ সাল থেকে পরিকল্পিতভাবে এই এলাকায় বাঙালিদের বসতি স্থাপন করা হয়, যাতে পাহাড়িদের জনসংখ্যার অনুপাত হ্রাস পেতে পারে।

বাঙালি বসতি সম্পর্কে দু'টি কথা প্রায়ই বলা হয়ে থাকে। এক, পাহাড়িরা পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী নন, তাঁরাও বাইরে থেকে এসেছেন। সেই অর্থে তাঁরা বাঙালিদের মতোই বহিরাগত। এই যুক্তি ধরে অগ্রসর হলে দেখা যাবে, আমরা কেউ কোনো এলাকার আদিবাসী নই, সকলেই বহিরাগত, এমনকি, আদম-হাওয়াও স্বর্গচ্যুত হয়ে

পৃথিবীতে এসেছিলেন, তাই তাঁরাও মূলত অন্য লোকের। দ্বিতীয় কথাটা এই যে, সংবিধানে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশের নাগরিকেরা দেশের যে-কোনো স্থানে বসতি স্থাপন করতে পারেন। তা নিশ্চয় পারেন, তবে দেশের আর কোথাও সরকারি উদ্যোগে, রাষ্ট্রীয় অনুদান দিয়ে, কাউকে যে বসতি করে দেওয়া হয়, তারও দৃষ্টান্ত নেই। এক হিসেবে বলা হয়েছে যে, দুই লক্ষাধিক বাঙালি পরিবার সেখানে গত কয়েক বছরে বসতি স্থাপন করেছে।

যুদ্ধকালের দুর্বিষহ অবস্থার পুনরাবৃত্তি এখানে করতে চাই না। একটা রাজনৈতিক বিষয়কে সামরিক বিষয়ে রূপান্তরিত করলে যা হয়, পার্বত্য চট্টগ্রামে তাই ঘটেছে। ১৯৭৯ সালে আমাদের সামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে আমার ধারণা হয় যে, তাঁরা এই সমস্যার সামরিক সমাধানে আস্থাবান। গত জুন মাসে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সৌজন্যে আমরা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক, তিনদিন ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকায় যাওয়ার সুযোগ পাই। এবারে সামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে আমার ধারণা হয়, এক-আধজন ছাড়া প্রায় সব সামরিক কর্তাই আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন যে, রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান রাজনৈতিকভাবেই করতে হবে। ভারত, শ্রীলঙ্কা ও ফিলিপিনসে সশস্ত্র অভ্যুত্থান-রোধে সামরিক বাহিনীর বহু বছরের প্রয়াস যে সফল হয়নি, সেকথা তাঁরা ভালো করে বোঝেন। উত্তর আয়ার্ল্যান্ডে দীর্ঘকাল ধরে যে-সংঘাত চলে আসছে, তার সমাধানও খোঁজ হচ্ছে রাজনৈতিকভাবে, একথাও কারো অজানা নয়। আমাদের সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামে রয়ে যেতে চায়, এমন ধারণার কোনো ভিত্তি আমি দেখতে পাইনি। সেখানকার জীবন অত্যন্ত কষ্টকর এবং ওই অঞ্চলে মশার কামড়ে নিহত বাঙালি সৈন্যের সংখ্য শান্তিবাহিনীর হাতে নিহত বাঙালি সৈন্যের চেয়ে বেশি।

পার্বত্য চট্টগ্রামে যুদ্ধবিরতি চলছে— মাঝে মাঝে তা যে ভঙ্গ হচ্ছে না, তা নয়, তবু ঠিক যুদ্ধাবস্থা নেই। ভারত ও বাংলাদেশে কাছাকাছি সময়ে সরকারের পরিবর্তন ঘটায় দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে এবং বাস্তব ব্যবস্থা-গ্রহণের ক্ষেত্রেও কিছু রদবদল ঘটেছে। নতুন করে শান্তি-আলোচনা শুরু হয়েছে এবং আশা করা যায়, খুব শীঘ্রি শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে শরণার্থী পাহাড়িরা অনেকে ফিরে এসেছে। আমরা যখন পার্বত্য চট্টগ্রামে গেলাম, তখন প্রত্যাগত শরণার্থীদের সঙ্গে এবং বাঙালি-পাহাড়িদের সঙ্গে মিলিতভাবে ও পৃথকভাবে কয়েকটি বৈঠক করার সুযোগ হলো। শরণার্থীদের অভিযোগ, তারা বাড়িঘর-জমিজমা ঠিকমতো ফেরত পাচ্ছে না; চিকিৎসার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ; বন্য হাতির উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে কয়েকটি পোল বসিয়ে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করার আবেদন জানিয়েও ফল পায়নি। এসব অভিযোগ কল্পিত নয়, বাস্তব। জমি ফেরত পাওয়ার ক্ষেত্রে একটা বড় সমস্যা এই যে, পাহাড়িদের ভূমিস্বত্ব-সংক্রান্ত কোনো দলিল নেই। জুম চাষ যারা করে, তারা একেক বছরে একেক জায়গায় তা করে থাকে। শুধু কারবারিরাই —অর্থাৎ এলাকার মোড়লেরা— তাদের পক্ষে বলতে পারেন যে, সে- জমি কার। অন্যদিকে তারা এক

জায়গা থেকে অন্য জায়গায় গেলে— সে-সময়ে অনুপস্থিত থাকার সুযোগ যে জমি দখল করে নেয়, সে তার দখল ছাড়তে চায় না। অনেক সময়ে হয়তো প্রশাসনের সম্মতি নিয়েই সে ওই জায়গা দখল করে রাখে।

প্রত্যাগত শরণার্থীদের প্রতি সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের তুলনায় বেসামরিক কর্মকর্তাদের আমার কম সহানুভূতিশীল মনে হয়েছে। সকলে নয়, তবে অনেকে। ডাক্তার থাকছেন না; বৈদ্যুতিক সংযোগ চাইলে বলা হচ্ছে আগুন জ্বালিয়ে হাতি তাড়ায় না কেন; জমির প্রশ্নে দলিলপত্রের কথা উঠছে। অন্য দিকে নতুন বসতিস্থাপনকারীদের অভিযোগ, সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসন পাহাড়িদের পক্ষে, কেননা পাহাড়িরা সহিংস কাজে লিপ্ত। তারা বলছে, বোধহয় আমরা সহিংস হলে সরকার আমাদের দিকটা দেখবে। কেউ কেউ ভয় পাচ্ছে, নতুন স্থানীয় প্রশাসন-ব্যবস্থায় পাহাড়িদের তুলনায় তাদের প্রতি বৈষম্য করা হবে। আর নতুন বসতিস্থাপনকারীদের সম্পর্কে পাহাড়িদেরও অনেক অভিযোগ।

এই অবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনা সহজ নয়, কিন্তু তা অবশ্যকর্তব্য। পাহাড়িদের মানতে হবে যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে। বাঙালিদের মানতে হবে যে, পাহাড়িরা গোষ্ঠীগত ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ে ভিন্ন। তাঁদের এই স্বাতন্ত্র্যকে শ্রদ্ধা করতে হবে, সেই সংস্কৃতি ও জীবনধারার স্বাভাবিক বিকাশ নিশ্চিত করতে হবে এবং বাংলাদেশকে বহুজাতিক দেশ বলে স্বীকার করে নিতে হবে। আমরা সকলে বাংলাদেশের নাগরিক, সংবিধান আমাদের সমানাধিকার দিয়েছে। সেই সমানাধিকারের ভিত্তিতে দেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধান আমরা চাই। আমরা শান্তি চাই, দেশের উন্নয়ন চাই, সমৃদ্ধি চাই। শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন হয় না। বরঞ্চ রাষ্ট্রকাঠামোয় কোনো গোষ্ঠী বিক্ষুব্ধ থাকলেই রাষ্ট্রের অখণ্ডতা বিপন্ন হয়।

দেশ

দেশ বলতে আমাদের কাছে একটা মানসচিত্র ভেসে ওঠে। চিত্রটা যে সবসময়ে এক হয়, তা নয়; কেননা দেশ কথাটা আমরা সর্বদা এক অর্থে ব্যবহার করি না। বিদেশী বিমানবন্দরে অচেনা পথিক যখন জানতে চান আমার দেশ কোথায়, তখন নির্দ্বিধায় বলি বাংলাদেশ। কিন্তু স্বদেশে ট্রেনের সহযাত্রী যখন ওই প্রশ্নই করেন, তখন নিশ্চিত জানি, ওই একই উত্তরে চলবে না। কেননা তিনি আসলে যা জানতে চান, তা আমার বাপ-দাদার ভিটের বিষয়ে। দেশের মধ্যে যে-ঘর, সেটাই তাঁর কাছে স্বদেশ।

এই সংকীর্ণ গ্রাম্য অর্থে দেশ শব্দটা যদি নাও গ্রহণ করি, তাহলেও দেশ সম্পর্কে কথা রয়ে যায়। নিজের কথাই বলি। আমি জন্মেছিলাম ব্রিটিশ ভারতে। অনেককাল পর্যন্ত তাই ভারতবর্ষকেই আমার দেশ বলে জেনেছি। পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ— সবই আমার মনে করাটা তখন স্বাভাবিক ছিল। তারপর দেশ বলে গণ্য করেছি পাকিস্তানকে— তার পূর্ব-পশ্চিমের দুই বাহু নিয়ে। যে-কলকাতা শহরে জন্ম নিয়েছি, বড় হয়েছি— তা আর তখন আমার দেশ নয়। ১৯৭১-এ আমার দেশের মানচিত্র থেকে পাকিস্তান কিংবা পাকিস্তানের পশ্চিম অংশ খসে গেছে। ১৯৪৭-এ যদি সোহরাওয়ার্দী-শরৎ বসুর সার্বভৌম ও যুক্ত বাংলার পরিকল্পনা সফল হতো, তবে পশ্চিম পাকিস্তান নয়, পশ্চিমবঙ্গই থাকতো আমার দেশের সীমানার মধ্যে। কলকাতা নিজের থাকতো, লাহোর-করাচি অন্য দেশ হয়ে যেতো। এখন পাকিস্তানও বিদেশ, পশ্চিমবঙ্গও ভারতের অংশ বলে বিদেশ।

নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে তাহলে কী বলবো, দেশের কোনো স্থিতিস্থাপকতা নেই? আমার দেশের মানচিত্র, দেশের প্রতি আমার আনুগত্য, স্বদেশবাসীর প্রতি ভালোবাসা— এসবের কোনো স্থিরতা নেই? কোনো চিরস্থায়ী বন্ধন নেই? ইতিহাসের একটা বড়ো তরঙ্গ এসে এর সবকিছু ভাসিয়ে নিতে পারে? 'আমার এই দেশেতে জন্ম, যেন এই দেশেতে মরি'— কাকে উপলক্ষ করে তাহলে এ কথা বলবো?

আমার অভিজ্ঞতায় আরো দেখছি, বাংলাদেশের বহু মানুষ ভিন্ন দেশে গিয়ে বসতি স্থাপন করছে, সেখানকার নাগরিকত্ব গ্রহণ করছে। তাদের কাছে কোনটি স্বদেশ? সৈয়দ শামসুল হকের উপন্যাসে লন্ডন-প্রবাসী এক বাঙালি যুবকের কথা আছে : শ্বেতাঙ্গের হাতে মার খেয়ে সে পালাবার পথ খোঁজে এবং নিজেকে বোঝায় যে, দেশটা তার নিজের হলে সে না পালিয়ে রুখে দাঁড়াতো। তার মতো অনেকেই থাকে বিদেশে, কিন্তু স্বদেশ বলে গণ্য করে ফেলে-যাওয়া দেশকে— যেখানে তারা বেড়াতে হয়তো আসবে তবে ফিরে আসবে না কোনোদিন। তবু ফেলে-যাওয়া দেশটির জন্যে তার দুর্ভাবনার অন্ত নেই। তাই সে বিলেত-আমেরিকায় বসে আওয়ামী লীগ-বিএনপির রাজনীতি করে, তার পরিচয়ও সেখানে এশিয়ান হিসেবে। এর পরের প্রজন্ম ফেলে-যাওয়া দেশে আসবে সম্ভবত ট্যুরিস্টের কৌতূহল নিয়ে কিংবা আসবেই না; রাজনীতি

করতে চাইলে কনজারভেটিভ-লেবার পার্টির মধ্যে বাছাই করবে বা রিপাবলিকান-ডেমোক্র্যাট হতে চাইবে। কাকে মনে রেখে তারা বলবে, 'স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে? এ দেশ তোমার নয়'?

এশিয়ানরা একা নয়। তাদের মতো স্প্যানিশ-আমেরিকানরা আছে। মার্কিন হয়েও ভিন্ন গোত্রের পরিচয়ধারী আরো অনেকে আছে। দেশপরিচয়ের সংকট আছে কত বিখ্যাত ব্যক্তির! রুশো জন্মেছিলেন সুইজারল্যান্ডে, আপদে-বিপদে ফিরে এসেছেন সেখানে, তবু তিনি ফরাসি। কিন্তু হ্যান্ডেল? তিনি কতটা জার্মান, কতটা ব্রিটিশ? পিকাসোকে স্পেনীয় বলা সঙ্গত, না ফরাসি? টি এস এলিয়ট শতকরা ক ভাগ ইংরেজ, ক ভাগ মার্কিন? আইনস্টাইন কী জার্মান, না সুইস, না আমেরিকান? এরিখ মারিয়া রেমার্ক জার্মান, না মার্কিন? ডিলান টমাস কি যতটা ইংরেজ তার চেয়ে বেশি ওয়েলশ? আর অস্কার ওয়াইল্ড-বার্নার্ড শ যতটা আইরিশ তার চেয়ে বেশি ইংরেজ? ওয়াল্টার স্কটকে ইংরেজরা দাবি করবে, স্কটিশরা ছাড়বে না। শেষোক্ত চারজন বৃহত্তম অর্থে যুক্তরাজ্যের মানুষ, তবু তার মধ্যেও ভাগ আছে। এখনো এঁদের পরিচিতি লিখতে 'আয়ারল্যান্ডে জাত' বা 'স্কটল্যান্ডে জাত' 'ইংরেজি সাহিত্যিক' বলে বর্ণনা করা হয়, যেমন জর্জ মিকাশ সম্পর্কে লেখা হয় 'হাঙ্গেরিয়ান বর্ন ইংলিশ অথর'।

আমরা প্রায়ই বলি, দেশ মানে মানচিত্র ও পতাকা নয়। কথাটা ঠিক। কিন্তু মানচিত্র ও পতাকা দেশেরই প্রতীক, ওটা তুচ্ছ করার বিষয় নয়। দেশ মানে মাটি ও মানুষ। আমাদের জন্যে, অনেকে বলেছেন, মাটি, পানি আর মানুষ। দেশকে ভালোবাসা মানে এই মানুষ ও নিসর্গকে ভালোবাসা। দেশের অপূর্ণতা জেনেও ভালোবাসা। কিংবা অপূর্ণতা জেনেই ভালোবাসা। আমার ভালোবাসার দেশটিকে যে পৃথিবীর সবচেয়ে সম্পদশালী দেশ হতে হবে কিংবা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অতুলনীয় হতে হবে, তা নয়। আমার সত্তার সঙ্গে দেশের ধুলোমাটি মিশে আছে বলেই তাকে ভালোবাসা।

দেশ শব্দের আরেকটা অর্থ আছে— অংশ। এই অর্থে আমরা বক্ষদেশ, কটিদেশ বা স্কন্ধদেশের মতো শব্দ ব্যবহার করি। দেশ যদি অংশ হয়, তাহলে তা কিসের অংশ? পৃথিবীর। সমগ্র বিশ্বের অংশ। এই সত্যটা বিস্মরণের যোগ্য নয়, অন্তত যে-কালে আমরা বাস করি, সেকালে তো নয়ই। সোয়া শ বছর আগে বঙ্কিমচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন যে, জাতি-প্রতিষ্ঠার মূলে অনেক সময়ে এই ভাব কাজ করে যে,

> .... পৃথিবীতে অন্য অনেক জাতি আছে। তাহাদের মঙ্গলমাত্রেই আমাদের মঙ্গল হওয়া সম্ভব নহে। অনেক স্থানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল। যেখানে তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল, সেখানে তাহাদের মঙ্গল যাহাতে না হয়, আমরা তাহাই করিব। ইহাতে পরজাতিপীড়ন করিতে হয়, করিব। অপিচ, যেমন তাহাদের মঙ্গলে আমাদের অমঙ্গল ঘটিতে পারে, তেমনি আমাদের মঙ্গলে তাহাদের অমঙ্গল হইতে পারে। হয় হউক, আমরা সেজন্য আত্মজাতির মঙ্গল সাধনে বিরত হইব না; পরজাতির অমঙ্গল সাধন করিয়া আত্মমঙ্গল সাধিতে হয়, তাহাও করিব।....

.... এইরূপ মনোবৃত্তি নিষ্পাপ পরিশুদ্ধ ভাব বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। ইহার গুরুতর দোষাবহ বিকার আছে। সেই বিকারে, জাতিসাধনের এরূপ ভ্রান্তি জন্মে যে, পরজাতির মঙ্গল মাত্রেই স্বজাতির অমঙ্গল, পরজাতির অমঙ্গল মাত্রেই স্বজাতির মঙ্গল বলিয়া বোধ হয়। এই কুসংস্কারের বশবর্তী হইয়া ইউরোপীয়েরা অনেক দুঃখ ভোগ করিয়াছে। অনর্থক ইহার জন্য অনেকবার সমরানলে ইউরোপ দগ্ধ হইয়াছে।

এই রচনার চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর পর ন্যাশনালিজমের গুরুতর ক্রটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ জগৎকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন। তবে সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ বা আধিপত্যবাদের সংগ্রামে জাতীয়তাবাদ যে শক্তি ও প্রেরণা জোগাতে পারে, তা তো আমরা নিজেদের অভিজ্ঞতায় দেখেছি।

তবে রবীন্দ্রনাথ আরো একটি কথা বলেছিলেন, বর্তমান ক্ষেত্রে যার প্রাসঙ্গিকতা খুব বেশি। *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসে সন্দীপের কথার জবাবে নিখিলেশ বলেছিল, 'আমার যা-কিছু মন্দ কিছুতেই সে আমি আমার দেশকে দেব না, দেব না, দেব না।' দেশকে যদি যথার্থই ভালোবাসি, তাহলে আমার যা শ্রেয়, তাই উৎসর্গ করবো তার জন্যে– এই মাটি ও পানি এবং জলকাদায় মাখা মানুষের জন্যে। তবেই আমার ভালোবাসার সার্থকতা।